শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

শুভ
আবির্ভাব তিথি
২০২৪

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

"জাগরণে যাঁরে দেখিতে না পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি দেখা দেয়,
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
সদা মনে হয় সে যে কাছে নাই;
যেন এ আমার আকুল আবেগ,
তাহারে আনিবে ডাকি,
দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি।"

পিতৃদেব ৺রমেন ভট্টাচার্য্য ও মাতৃদেবী ঁসুমিত্রা ভট্টাচার্য্যকে স্মরণে রেখে

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
নীলাঞ্জন, সোহিনী, অঙ্কিত ও আরভ্
মুম্বাই

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

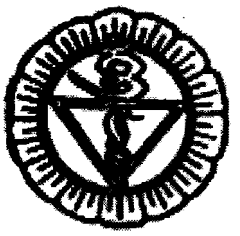

৬৩তম বর্ষ ● শুভ আবির্ভাব ১৪৩১ সন ● চতুর্থ সংখ্যা

সেক্রেটারী: শ্রী সুরজিৎ দে

সম্পাদিকা: শ্রীমতী কনিকা পাল

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এ.ই. ৪৬৭ সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

ফোন: ২৩২১-৫০৭৭/৫১২৩, মোবাইল: ৮০১৭২২৭০৯৯

E-mail: sreesreemohananandatrust@gmail.com / mohananandasamaj@gmail.com

মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। ফোন: ৯৮৩০১৮৮৭২৪

সূচীপত্র

সতাং প্রসঙ্গ	শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ	৯১
দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমূহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী		৯৫
গীতার মর্ম (পরবর্তী অংশ)	শ্রীদেবপ্রসাদ রায়	৯৬
কাশীতে কয়েকটা দিন	শ্রী সোমনাথ সরকার	৯৯
কর্মাবাই	শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়	১০২
আমাদের মহারাজ	শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল	১০৪
বৃক্ষোৎসব (২)	শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক	১০৭
জন্মতিথি স্মরণে প্রণাম	শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৮
পুণ্যপরশ-পুলক (১৭শ পর্ব)	শ্রীবসুমিত্র মজুমদার	১০৯
স্মৃতির আলোকে বিগতদিন	শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র	১১১
বৈদ্যনাথ ধামের সচল বৈদ্যনাথ	শ্রী রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়	১১৪
Distributing Centres of Sree Sree Baleswari Patrika		১১৮
MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY		১২০
উদার অভ্যুদয়... (সম্পাদকীয়)		১২২

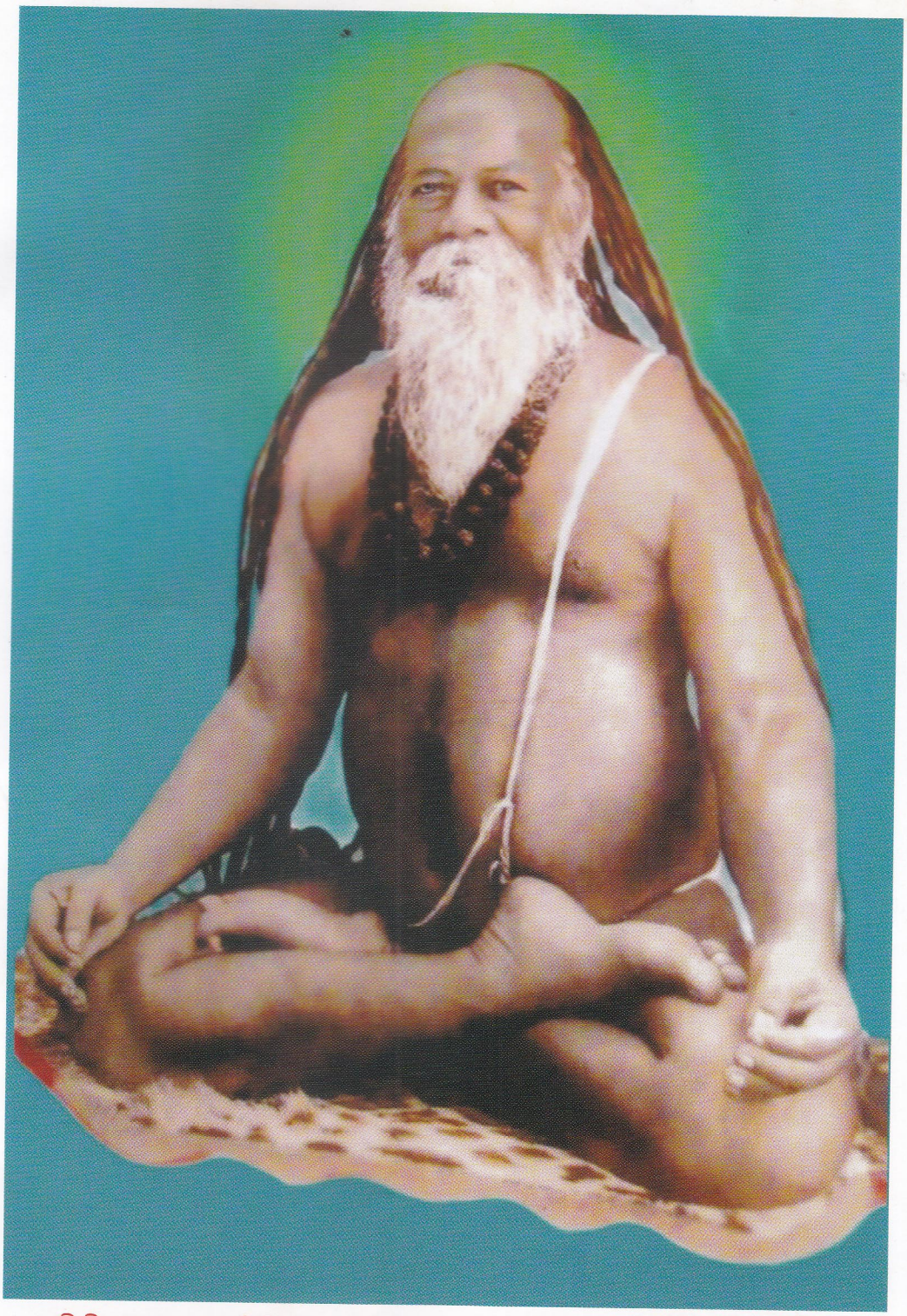

শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর স্মরণে শ্রী অরূপ সেন ও শ্রীমতী কাবেরী সেনের— সৌজন্যে।

সতাং প্রসঙ্গ

স্থান শিলং ১৬ই জানুয়ারী ১৯৫৮ বৃহস্পতিবার। বেলা এগারোটা আন্দাজ হয়েছে। শ্রীযুক্ত অবনীমোহন দামেরবাড়ী। শ্রীশ্রীমহারাজ সাড়ে দশটার সময়ে হোম পূজা সমাপন করেন। বাইরের লনে পায়চারি করছিলেন। কীর্ত্তনের আগে অল্প কিছুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখের কথা শুনবার জন্য সকলেই অপেক্ষা করে আছেন আশা এবং কামনা নিয়ে। তাই জন্যে তিনি ঘরে এসে আসনে ব'সলেন। তাঁর চরণ তলে বসে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা বাবা, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে এক জায়গায় পড়ছিলাম, প্রথমে এক হাতে কর্ম করে যাও। এক হাতে তাঁর চরণ ছুঁয়ে থাক। কিন্তু ক্রমে এমন হবে যে, দুই হাতেই তাঁর চরণ জড়িয়ে ধরতে হবে। তাহলে আমাদের সকল কর্মের অবসানে, বন্ধনের অবসানে তিনিই তো সব। আমাদের এই জীবনেই সেইরূপ হবে কী উপায়ে?"

শ্রীশ্রীমহারাজ খুব অন্তর্মুখ অবস্থায় রয়েছেন। সেই কমল নয়ন দুটি প্রেম বিবশ। কথাগুলি যে বলছেন তা'ও অতি মৃদুস্বরে! তাঁর একান্ত চরণ সমীপে বসে রয়েছি বলেই যেন শুনতে পাচ্ছি।

শ্রীশ্রীমহারাজঃ— "**পরাপ্রেম লাভ হলে তখন** আর কর্ম করবার ক্ষমতা থাকে না। ভক্তি সাধনের লক্ষণ কি? মহাপ্রভু তাহা **সনাতনকে বলছেন,**

"অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ,
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।
এই শুদ্ধাভক্তি—ইহা হৈতে প্রেম হয়,
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণকয়।"

"তাই ভক্তির লক্ষণে আরও বলা হয়েছে"ঃ—

"অন্যা ভিলাষিতা শূন্যাং, জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"

"কর্ম, জ্ঞান সমস্ত আবরণ উন্মোচিত করে—সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বস্ব দ্বারা তাঁর অনুকূল অনুশীলন করাই উত্তমাভক্তি। তাই চিরতা-ম-তে আছে মহাপ্রভু রামানন্দের কাছে সাধ্য সাধন কথা শুনতে বসেছেন— কিছুতেই তাঁর আর তৃপ্তি হচ্ছে না। মহাপ্রভু প্রশ্ন করছেন, রায় রামানন্দ বলে যাচ্ছেন—

"রায় কহে, স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।
প্রভু কহে, এহোবাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে, কৃষ্ণে কর্মার্পণ সর্ব সাধ্য সার।
প্রভু কহে, এহোবাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার।
প্রভু কহে এহবাহ্য আগে কহ আর।
রাম কহে জ্ঞান শূন্যভক্তি সাধ্য সার।

এতক্ষণে প্রভু এহ বাহ্য না বলে, বল্লেন, 'এহ হয়, আগে কহ আর।' এইরূপে যতক্ষণ অবধি না

জ্ঞান শূন্যাভক্তি বা প্রেমের রাজ্যে এসেছেন ততক্ষণ মহাপ্রভু এহ বাহ্যই বলে গেছেন। তারপর প্রেমের রাজ্যে এসে পৌঁছেও সখ্য-বাৎসল্য মধুর সমস্ত শুনেও এই উত্তম পর্য্যন্তই বলেছেন— তৃপ্তি আর তাঁর হচ্ছে না— তৃষ্ণার শান্তি হচ্ছে না। আরও আগেকার কথা শুনতে চান। শ্রীশ্রীমহারাজ আজ আসনে এসে যখন বসলেন তখন থেকেই খুব অন্তর্লীন অবস্থায় ছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কথা বলতে যেয়ে খুবই অভিভূত হ'য়েছিলেন। তাই এই কথা বা প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করবার জন্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা বাবা, ভক্তি আর প্রেমে তফাৎ কোন খানে?"

শ্রীশ্রীমহারাজঃ— "ভক্তি হচ্ছে তোমার দিক থেকে তাঁকে ধরবার চেষ্টা সাধনা দ্বারা, তাঁর প্রিয় কর্ম সম্পাদনের দ্বারা তাঁকে পাবার জন্য তুমি ঐকান্তিক চেষ্টা করছ। তোমার দিক থেকে চেষ্টার ও ব্যাকুলতার অভাব নেই। এইটি হলো ভক্তি। আর প্রেম হলো তিনি যখন নিজে নেমে এসে তোমার হাত ধরেছেন। পূর্ণ শরণাগতি না হলে প্রেমের উদয় হয় না। যখন আমার বলতে আর কিছুই থাকবে না, সব কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা, আশা, আকাঙ্খা সকলই তাঁর কাছে সমর্পিত হবে তখনই তিনি নিজে এসে তোমার হাত ধরবেন। তখনই কবির ঐ সঙ্গীতটি তোমার জীবন বীনার তারে ধ্বনিত হতে থাকবেঃ—

"তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা
মাথায় তুলিয়া লব। ওহে জীবন বল্লভ।"

"তখন বিশ্ব সংসারে যত কাম্য বস্তুই পাওনা কেন, আগে দেখে নেবে ঃ—

"সব ধন মাঝে তুমি আছ কি না
তা যেন যাচাই করি।"

জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের কবে এমন পূর্ণ শরণাগতি হবে বাবা?"

শ্রীশ্রীমহারাজ— "যতক্ষণ সংসার বাসনায় লেশমাত্র আছে ততক্ষণ হবে না। যখন তিনি ছাড়া তাঁর ভাবনা ছাড়া জীবনে আর কিছুই থাকবে না তখনই শরণাগতি আসবে, তার আগে নয়।" জিজ্ঞেস করলাম, "তাঁর কৃপা ছাড়া তো তাঁকে পাবার কোনই উপায় নেই। আমাদের দিক থেকে সাধনাই বলুন আর তপস্যাই বলুন এ সব শুধু খানিকটা ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে তাঁর করুণা উন্মথিত করে তোলা ছাড়া আর তো কিছুই নয়। তাই জন্যে যশোদা যখন আপন গর্ভে কৃষ্ণকে বাঁধতে যেয়ে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লেন, তাঁর বেস-বাস ত্রস্ত ধুলিময়, দেহ ঘর্ম-সিক্ত—তবু পারছেন না বাঁধতে। তখনই মায়ের এই ক্লান্ত বিপর্য্যস্ত চেহারা দেখে কৃষ্ণের দয়া হলো। নিজেই বাঁধনে ধরা দিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেনঃ

"ওরে কুশীলব, কী করিস গৌরব
ধরা নাহি দিলে, কি পারিস ধরিতে?"

শ্রীশ্রীমহারাজ আরও এক পর্দা সুর চড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "ধরা আর তিনি নতুন করে দেবেন কি, নূতন করে কৃপা করবেন কি? তিনি যে সর্ব্বদা কৃপা করেই আছেন। তাঁর কৃপা নিরপেক্ষ। কোন যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার নাই সেখানে। কোন পক্ষপাত নাই। তাঁর কৃপা সর্বদাই পূর্ণ সর্বদাই স্বতোৎসারিত। সাধারণ মানুষে কৃপা করে, তার মধ্যে বিচার, বিবেচনা, তুলনা, যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার এসব অপেক্ষা থাকে। কিন্তু তাঁর কৃপায় অপেক্ষা নাই, তাহা অহৈতুক। নিত্য নিরন্তর তাহা বয়ে চলেছে। সে স্রোতের বিরাম নেই। যে যেমন নিতে পারে।" তারপর অল্পকাল নীরবে থেকে আবার

বললেন, "এই যে যজ্ঞ, এর অর্থ কি?" যজ্ঞ মানে, তিনি নিজেই নিজের রুধির পান করছেন। এইরূপে নিজেকে খণ্ড খণ্ড করে বিলিয়ে দিচ্ছেন।"

শ্রীশ্রীমহারাজ যখন ভাবময় হয়ে যজ্ঞের এই অর্থের কথা বলছিলেন তখন আগতপ্রায় দেওঘর আশ্রমের যজ্ঞের কথা মনে পড়ে গেল। মনশ্চক্ষে সেই সব দৃশ্য গুলি ভেসে উঠতে লাগলো সেই ধূ ধূ করে দিবারাত্র অবিশ্রান্ত আগুন জ্বলছে, আর তিনি সেই আগুনের সামনে বসে প্রতিক্ষণে নিজেকেই নিঃশেষে আহুতি দিচ্ছেন বিশ্বের কল্যাণ জন্য। এই যজ্ঞটি শ্রীশ্রীমহারাজের ইষ্টদেবতা শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজের নিত্য আবির্ভাব স্মরণে। আর তাঁর আবির্ভাব মানেই তো আত্মদান। আজ সৎপ্রসঙ্গ করতে আসনে বসেই তিনি এমন এক ভাবভূমি থেকে অতি ধীরে মৃদুস্বরে অন্তর্লীন অবস্থায় শ্রীমুখের কথিত বিষয় গুলি বলছিলেন। তাই তিনি যখন বলছিলেন, "তিনিই যজ্ঞের অগ্নি, তিনিই আহুতি আবার তিনি নিজেই যজ্ঞের পশু। নিজেই নিজের রুধির পান করছেন। নিজেই নিজেকে হনন করে খণ্ড খণ্ড রূপে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিতেছেন বিশ্ব কল্যাণের জন্য—" তখন আমরাও বিস্ময় সংমূঢ় হয়ে শ্রীশ্রীমহারাজের অচিন্ত্য স্বরূপের পানে নির্নিমেষে চেয়েছিলাম। এই কি সেই তিনি? বিরল দৈবী মুহূর্ত্তে আপন স্বরূপের পরিচয় যিনি আপন শ্রীমুখে দিতেছেন! তাঁর ভাগবতী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তের ইতিহাসই যে এই। নিঃসর্ত্ত হয়ে প্রতিক্ষণে নিজেকে অপরের কল্যাণ কামনায় বিলিয়ে দেওয়া। আর যোগ্যতা অযোগ্যতার কোন বিচার না করেই অহৈতুকী নিরপেক্ষ কৃপা বিতরণ।

জিজ্ঞেস "করলাম, আমরা সংসারী— কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিমত সাধন ভজন তপস্যা কোনই সম্বল নাই। আমাদের দিক থেকে একমাত্র ব্যাকুলতা ছাড়া আর তো কিছু নেই। এতে কি আপনাকে পাব?"

শ্রীশ্রীমহারাজ ঃ— "ব্যাকুল হলেই মা ছুটে আসেন। যে ছেলে খেলা নিয়ে মত্ত হয়ে আছে তার কাছে মা আসেন না। যে খেলে খেলে ক্লান্ত হয়েছে, আর খেলা ভালো লাগেনা— মায়ের কাছে যাবার জন্য কাঁদছে, তার কাছেই মা ছুটে আসেন। তোমার যদি তেমন তৃষ্ণা না পায়, তাহলে অনেক দূরে জল আছে শুনলে হয়তো তুমি জলের কাছে না যেতেও পার। কিন্তু তোমার তৃষ্ণা যদি প্রবল হয় যতদূরেই জল থাক, তুমি ছুটে যাবে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে বাবা, পুরুষাকারও তো চাই। যেমন জলের কাছে ছুটে যাওয়া। আমাদের দিক থেকে ও তেমনই চেষ্টা ব্যাকুলতা না থাকলে চলবে কেন?"

শ্রীশ্রীমহারাজ ঃ— "কেন বুঝতে পারছ না, তিনি যে সর্বদাই প্রতি নিমেষে সকলক্ষণে কৃপা করেই রয়েছেন। নতুন করে আর কী করবেন? তাঁর প্রবাহ সর্বদাই বয়ে চলেছে। পুরুষাকার বা ব্যাকুলতা হলে তোমাদের দিক থেকে তাঁর কৃপার প্রবাহ ধরবার বুঝবার সুবিধা হয়। এই মাত্র।"

শ্রীশ্রীমহারাজ নীরবে রয়েচেন, তাই আবার জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা বাবা, শাস্ত্রে বলে শ্রীগুরুই আমাদের কাছে ভগবানের জীবন্ত প্রকাশঃ 'নর ত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে—' তাঁর প্রতিই আমাদের পূর্ণ শরণাগতি কী ভাবে হবে?"

শ্রীশ্রীমহারাজ ঃ— "প্রথমে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা চাই। কিন্তু দায়িত্বটা উভয়তঃ। শোননি একটা কথা আছেঃ "গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক।" গুরুকেও পরীক্ষা করে নিতে হবে। যিনি হাজার হাজার লোকের ভার গ্রহণ করবেন তাঁকে কি পরীক্ষা করে নেবে না? নইলে এক অন্ধ যেমন আর এক অন্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে দু'জনেই খানায় পড়ে, তাই হবে যে। প্রথমটায় কোন শিষ্য হয়তো খুব

শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে গুরুর কাছে এসেছেন। কিন্তু তেমন উপকার না হলে শ্রদ্ধা বিশ্বাস ক্রমেই শিথিল হয়ে আসবে। যেমন বিশ্বাস নিয়ে এক ডাক্তারের কাছে গেল, কিন্তু তিনি কোন মতে রোগ সারাতে পারলেন না। তখন বাধ্য হয়েই অন্য বৈদ্যের শরণাপন্ন হতে হলো। তাইজন্যে শিষ্যের ও গুরুকে পরীক্ষা করে নিতে হবে। যার ভক্তি প্রধান চিত্ত তার সেইরূপ গুরুর আশ্রয় প্রয়োজন। যে কর্মী তার তদনুরূপ গুরু আবশ্যক। যেমন কলেজে ম্যাথামেটিক্সের প্রফেসরের কাছে গেলে হিস্ট্রির ছাত্রের উপকার হবে কি?"

আমি বললাম, "না বাবা, এমন করে আপনি বলবেন না। আমরা গুরুকে পরীক্ষা করবার কী জানি! গুরু আমাদের কাছে পূর্ণতার শরীরী প্রকাশ। তিনি সর্বদাই পূর্ণ। তাঁকে এমন করে খণ্ড খণ্ড করে বিচার বিশ্লেষণ করে সংসারের আর পাঁচটা জিনিষের মত বিচার করতে বলবেন না। তিনি আপন আত্মার অপরিমেয় শক্তির দ্বারা আমাদের শক্তি সঞ্চার করেন। তাঁর প্রেম তাঁর শক্তি সর্বদাই পূর্ণ সর্বদাই বহমান। সেখানে খণ্ডতার স্থান নেই। ডাক্তার আর অধ্যাপকের সঙ্গে কেন তুলনা বাবা? ডাক্তার আর অধ্যাপক প্রেম না হলেও রোগ সারাতে পারেন, অঙ্ক শেখাতে পারেন। কিন্তু তিনি যে কেবল তাঁর অহৈতুকী প্রেম দিয়েই আমাদের সুপ্ত লুপ্ত দেবত্বকে জাগিয়ে দেন।"

শ্রীশ্রীমহারাজ: "যিনি গুরুকে এইভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাঁর দৃষ্টিও অখণ্ডতা লাভ করেছে। বস্তুতঃ এই অখণ্ড দৃষ্টি লাভ করলে তখন শুধু গুরু কেন তিনি জগতের সর্ব্বত্রই সকল বস্তুর মাঝে সেই অখণ্ড পূর্ণ স্বরূপকে দর্শন করবেন। সে দৃষ্টির কথা স্বতন্ত্র। তাহা যখন অভিব্যক্ত হবে তখন গুরু ও শিষ্যের তো কোন ভেদই থাকবে না। কারণ সেই পূর্ণতম গুরুর মধ্যেও যেমন, শিষ্যের মাঝেও ঠিক তেমনই। পূর্ণ তো আর দুই হতে পারে না। তাই জন্যে বাউল গানে রয়েছে।

"সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্য দেখা নাই।"

একটি কাহিনী আছে, একজন ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট আশ্রয় প্রার্থী হয়ে শিষ্য হতে গেছেন। গুরু হেসে বললেন, "তুমি আগেই গুরুদক্ষিণা দিয়ে দাও। কারণ তুমি যখন সিদ্ধ হবে ও ব্রহ্ম স্বরূপতা লাভ করবে, তখন তো তুমি আমি এক হয়ে যাব। তখন আর কে কাহাকে দক্ষিণা দেবে!" এই অবস্থা লাভ হলে কী যে হয়, সংস্কৃত একটি শ্লোকেও তার আভাস আছে:—

"গুর্রোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানম্
শিষ্যাস্তু ছিন্ন সংশয়াঃ।"

গুরুর সামনে শিষ্য বসে আছেন নীরবে। বাহ্যিক কোন কথা বার্ত্তার আদান প্রদান নাই। কিন্তু সেই মহামৌনের অন্তরালে শিষ্যের যা কিছু সংশয় সমস্তই নিরসন হয়ে যাচ্ছে। তখন আর বাইরের কোন কিছুতেই প্রয়োজন থাকে না। অন্তরে তখন দুই এক। এক তারে বাঁধা দু'জনে।

জিজ্ঞেস করলাম, "বৈষ্ণব শাস্ত্রে ঐ যে উপদেশ আছে;

"বাহ্যে সাধক দেহে শ্রবণ কীর্ত্তন,
মানসে সিদ্ধ দেহ করিয়া চিন্তন।
দিবারাত্র ব্রজে করে যুগল রাধা কৃষ্ণের সেবন।।"

এর অর্থ কি বাবা?"

শ্রীশ্রীমহারাজ:— "তাঁর সঙ্গে যাঁরা সর্বদাই যুক্ত তাঁরা এই বাহ্য দেহে জপ পূজা সাধন ভজন সবই করে যাচ্ছেন, অনেক সময় লোক কল্যাণ বা শুভকর্ম ও শিক্ষার জন্য।

দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমূহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী

২০২৫ সাল	১৪৩১ সন	উপলক্ষ্য
১লা জানুয়ারী	১৬ই পৌষ বুধবার	ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষ্যে কলিকাতা স্থিত জামির লেন, শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর বিশেষ পূজা, অভিষেক ও প্রসাদ বিতরণ।
৩রা ফেব্রুয়ারী	২০শে মাঘ সোমবার	দেওঘর আশ্রমে শুভবসন্তপঞ্চমী তিথিতে ৺শ্রীশ্রীবালাত্রিপুরাসুন্দরী দেবী মাতার বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা উৎসব এবং শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক ভাণ্ডারা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা ও শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা।
১০ই মার্চ	২৫শে ফাল্গুন সোমবার	৺পুরী শ্রীশ্রীবালানন্দ তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীপরমগুরু মহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব এবং রাত্রে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা।
১১ই মার্চ	২৬শে ফাল্গুন মঙ্গলবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীপরমগুরুমহারাজজীর আর্বিভাব তিথি উপলক্ষ্যে ৪দিন ব্যাপী শ্রীশ্রী৺বিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞ, বিশেষ পূজা, অভিষেক, অখণ্ডনাম সংকীর্ত্তন, ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা।
১৩ই মার্চ	**২৮শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার**	**সায়ংকালে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা। (সন্ধ্যা ঘ৫।৩৯।৪৮ থেকে রাত্রি ঘ ৭।১৫।৪৮ সে.) মধ্যে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ ব্রতম।**
১৪ই মার্চ	**২৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার**	**শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমা, শ্রীশ্রী৺বিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞের পূর্ণাহুতি, দেবীমন্দিরে পরাৎপর গুরু শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ স্থাপনা তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক।**
২৭শে মার্চ ২৯শে মার্চ	১৩ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার ১৫ই চৈত্র শনিবার	হৃষিকেশ আশ্রমে সকল দেবদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বার্ষিক তিথি উপলক্ষ্যে ৩দিবস ব্যাপী শ্রীশ্রী ৺বিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞ, ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা।
৩১শে মার্চ	১৭ই চৈত্র, সোমবার	পুরী শ্রীশ্রীবালানন্দ তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীমোহনেশ্বর মহাদেব মন্দিরে শ্রীশ্রীনর্মদেশ্বর শিবের ৭তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ষোড়শোপচার বিশেষ পূজা, রুদ্রাভিষেক, হোম এবং ভাণ্ডারা প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করা হইবে।
১লা এপ্রিল	১৮ই চৈত্র, মঙ্গলবার	দেওঘর তপোবন আশ্রমে শ্রীশ্রীপরমগুরু মহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্র নারয়ণ সেবা।
৩রা এপ্রিল ৭ই এপ্রিল	২০শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার ২৪শে চৈত্র, সোমবার	বাঁকুড়া তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা উৎসব।
৪ঠা এপ্রিল ৬ই এপ্রিল	২১শে চৈত্র, শুক্রবার ২৩শে চৈত্র, রবিবার	বারাণসী তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণামাতার বার্ষিক প্রতিষ্ঠা তিথি ও শ্রীশ্রীপরমগুরু মহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ৩ দিবসব্যাপী লঘুরুদ্র যজ্ঞ, বিশেষ পূজা, পাঠ, অভিষেক, সাধু ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করা হইবে।
১৫ই এপ্রিল	১৪৩২ সন ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার	কলিকাতা জামিরলেন স্থিত শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর বিশেষ পূজা, অভিষেক ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালিত হইবে।

গীতার মর্ম (পরবর্তী অংশ)

শ্রীদেবপ্রসাদ রায়

'আমি কম বুঝি', এই বোধ এলে জিজ্ঞাসা জাগে। 'ব্রূহি তন্মে', এটা অর্জুনের জিজ্ঞাসার ভাষা। কোন্‌টি জঙ্গলের পথ, তা নির্ণয় করার ক্ষমতা অর্জুনের নেই, নিজে তা অনুভব করে বলছেন, যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতম্‌ যেটি নিশ্চিত শ্রেয়ঃ তাই বল।

অর্জুন বুঝেছেন, কল্যাণের পথ বুঝে নেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। কেবল তাই নয়, কেউ বুঝিয়ে দিলেও যে তা গ্রহণ করবার শক্তিটুকু তাঁর নেই। তা তিনি ক্রমশঃ অনুভব করছেন। আমি শক্তিহীন, এই বোধ জাগলেই শক্তিমানের উপর নির্ভরতা আসে। তখন সাধক বলেন শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌—শরণপ্রার্থী অর্জুন তাই বলেন, আমি শিষ্য, তুমি গুরু, আমাকে শাসন কর শিক্ষা দাও, উপদেশ দাও। আমি প্রপন্ন, আমি শরণাগত, আশ্রয়প্রার্থী, তুমি প্রপন্নার্তিহর, শরণাগত পালক, একান্ত আশ্রয়ণীয়, তুমি আমাকে স্থান দাও।

কার্পণ্যদোষ— কৃপণ কথার লৌকিক অর্থ যোঽল্পাং স্বল্পামপি বিত্তক্ষতিং ন ক্ষমতে স কুপনঃ— যে নিজের অল্প ক্ষতিও সহ্য করতে পারে না।

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায়হায়।
"নদীতটসম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আকড়ি রাখিবারে চাই
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা যায়।"

আর এর বৈদিক অর্থ—শ্রুতিতে আছে, যো বা এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ (বৃ, উ ৩।৮।১১) হে গার্গি, অধিকারী মনুষ্যদের পেয়েও যে ব্যক্তি এই অক্ষর আত্মাকে বিদিত না হয়ে ইহলোক পরিত্যাগ করে, সেই অজ্ঞান পুরুষ কৃপণ। মমতা, অজ্ঞান, অভিমান ত্যাগ না করলে ব্রহ্মাকে জানা যায় না। যে ব্যক্তি মমতা বা অভিমান বা অজ্ঞান ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত, সেই কৃপণের ভাব (স্বভাব) কার্পণ্য অর্থাৎ দৈন্য। সেই দৈন্যরূপ দোষের দ্বারা যার স্বভাব (চিত) দূষিত হয়েছে— তাই বলেছেন, কার্পণ্য দোষাপহত স্বভাব। 'কৃপ্‌' ধাতু থেকে 'কৃপণ' তা থেকে কার্পণ্য। ধাতুটির প্রাচীন অর্থ বিলাপ করা। যে বিলাপ করে, সে কৃপণ, সে শোকাচ্ছন্ন, তাই শোকও কার্পণ্য। শব্দটি দৈন্যও বোঝায়। গীতায় আছে— কাপণাঃ ফলহেতবঃ (২/৪৯)— অর্থ ফলাকাঙ্খাকে যে কর্মের হেতু বা প্রযোজক মনে করে, সে কৃপণ, কিনা তার বুদ্ধির দৈন্য আছে। শোক আর মোহ যথাক্রমে চিত্তে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, আর তাকে আচ্ছন্ন করে। এদুটি রজোগুণ এবং তমোগুণের ক্রিয়া। এতে স্বভাব উপহত ও পরিণামে পঙ্গু হয়ে থাকে, আপন মহিমায় ফুটতে পারে না। এই শোক আর মোহকেই বলা হয়েছে কার্পণ্য দোষ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুন আপনাকে দীন ভাবাপন্ন জেনে জগদ্‌গুরু কৃষ্ণের সখ্য ছেড়ে শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন। কেননা পুত্রভাবাপন্ন বা শিষ্য হয়ে জিজ্ঞাসু না হলে উপদেষ্টার কাছ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করা যায় না। অর্জুন পরমপুরুষার্থ রূপ শ্রেয় উপদেশ প্রার্থনা করলেন। শ্রেয়ঃ দুরকম— ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক। যেখানে শুভলাভের অনিশ্চয়তা এবং পেলেও অস্থায়িত্ব আছে, তা ঐকান্তিক এবং যা নিশ্চয় শুভদায়ক ও যে শুভ কখনও নষ্ট হবার নহে, তা আত্যন্তিক। যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গফলাদি লাভ ঐকান্তিক ও ব্রহ্মাত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ। এই আত্যন্তিক শ্রেয়ঃই পরমপুরুষার্থজনক। এই শ্রেয়োলাভই অর্জুনের প্রার্থনীয়। শ্রুতিতে আছে তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভি গচ্ছেৎ সমিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমিতি—ব্রহ্ম্য— সাক্ষাৎকারের জন্য এই অধিকারীপুরুষ সমিৎপাণি হয়ে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে যাবে।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোক মুচ্ছোষণ মিন্দ্রিয়াণাম্
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরানামপি চাধিপত্যম্।। ২/৮

অপনুদ্যাদ্-নিবারণ করতে পারে। উচ্ছেষণম-সন্তাপকর। অবাপ্য-পেয়ে। ভূমৌ-পৃথিবীতে। অসপত্নম্-শত্রুশূন্য। ঋদ্ধং-সমৃদ্ধিপূর্ণ।

পৃথিবীতে নিষ্কন্টক রাজ্য, এমন কি দেবগণের আধিপত্য পেলেও আমার ইন্দ্রিয় সন্তাপকর এই শোক দূর করতে পারে, এমন কিছুই আমি দেখছি না।

ব্যাখ্যা— অর্জুন আর্ত ও জিজ্ঞাসু ভক্ত। ভক্তিতে তাঁর প্রাণ সরস হয়ে উঠেছে। কণ্ঠ তাঁর গদগদ, করযুগল যুক্ত। ভক্ত এসেছেন। এবার ভগবান আসবেন/রথী অর্জুনের পাশে সারথি ভগবানকে দেখেছি/ ক্লৈব্যযুক্ত অর্জুনের পাশে 'তোত্রবৈত্রেক পাণি' সন্তাড়ন বেত্রদণ্ড শোভিতহস্ত উপদেষ্টা গুরুমহাশয়কে দেখেছি। এবার ভক্ত অর্জুনের পাশে জ্ঞানমুদ্রাধারী গীতমৃত দোহনকারী ভগবানকে দেখব। ভক্ত ও ভগবান এই শব্দদুটি আপেক্ষিক (Relative term)। ভক্ত না আসা পর্যন্ত তিনি বিশ্বব্যাপী চৈতন্যসত্ত্বা- ভগবান নন। পিতা পুত্রের জনক বটে, কিন্তু পুত্রের পুত্রত্বই পক্ষান্তরে পিতার পিতৃত্বানুভূতির জনক।

অর্জুন শাস্ত্রবেত্তা হলেও ভগবানের কাছে শিষ্যের কর্তব্যানুরূপ নিজ ত্রুটি, অদূরদর্শিতা ও অজ্ঞানতার পরিচয় দিলেন। শাস্ত্রবেত্তা হলেই যে শোকসন্তাপের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় তা নয়। দেবর্ষি নারদস্ত সনৎকুমারকে বলেছিলেন 'সোহহং ভগবঃ (ছাউ৭।১।৩) শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তাবয়তু'। হে ভগবন! আপনার ন্যায় মহাত্মার মুখে শুনেছি যে, আত্মবিদ্‌গন শোক থেকে নিস্তার করেন। আমি শোকসন্তপ্ত-আত্মবোধবিহীন- আপনি আমার শোকাপনোদন করুন। অর্জুনের শোক-মনস্তাপ সাধারণ নয়। তা বিপুল বৈভব রাজ্য বা স্বর্গপ্রাপ্তি আদি কোন অনিত্য বস্তুদ্বারা নিবৃত্ত হবার নহে। (ছা-উ ৮।১।৬) তে আছে— তদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমোবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে'— কর্মভোগের জন্য ইহলোকপ্রাপ্ত বিষয়াদি যেমন নশ্বর, পুণ্যলব্ধ স্বর্গাদিও সেইরকম বিধ্বংসধর্মী। বিজয় লাভের রাজ্যলক্ষ্মী হস্তগতই হোক, অথবা সম্মুখ সমরে মরণজন্য স্বর্গলাভই হোক, অর্জুনের শোক এর কিছুতেই নিবৃত্ত হবেনা, বরং বৃদ্ধি পাবে।

অর্জুন এখানে বলছেন, শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্— আমি তোমার শরণাগত। মনে হতে পারে যে, শিষ্যত্ব স্বীকারের পর আবার প্রপন্ন— শরণাগত বললেন কেন? যে অনুশাসন মেনে চলতে

প্রস্তুত, সে শিষ্য অর্থাৎ কিনা অনুশাসনযোগ্য। শিষ্য, প্রধানতঃ বিধেয় অর্থাৎ আজ্ঞাবহ। 'নির্বিচারে করি আদেশ পালন— এটা হৃদকে তটস্থ রেখেও করা যেতে পারে। প্রপত্তি বা শরণাগতি আরও গভীরের ধর্ম। বুদ্ধি আর হৃদয় দুইইনা দিতে পারলে প্রপত্তি বা আত্মনিবেদন সার্থক হয়না। শিষ্য মানেই যে প্রপন্ন, তাতো নয়।

ধর্মসংমোহ জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্— তাকে সাক্ষাৎ করা সহজ নয়। তারজন্যও দীর্ঘদিনের অনুশীলন প্রয়োজন। তাই ধর্ম সম্পর্কে সংমোহ বাসংশয় সবার জীবনেই আসে, বিশেষত যখন জাতিধর্ম বা কুলধর্ম এক কথায় প্রথাগত সামাজিক ধর্মের সঙ্গে অন্তরের শাশ্বত ধর্মের বিরোধ দেখা দেয়। কি শ্রেয়, তানিঃসংশয়ে বোঝা যায় একমাত্র অন্তর্যামীর নির্দেশে। সে নির্দেশ আবার বুঝতে পারা যায় অন্তরাত্মা প্রসন্ন হলে। তিনি যখন বুদ্ধির দীপ হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেন, তখনই। তখন আমাতে আর তাঁতে ভেদ থাকে না। ক্রমশঃ

ভক্তির সাধন পর্যন্তই আমাদের অধিকারসীমা। এর পরের অবস্থায় আমাদের হাত নেই। তখন জ্ঞানের ভূমিতে তিনি এসে তাঁর সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে নেন। তাই জন্য শ্রীঅরবিন্দও তাঁর Essays in Gita-র একস্থানে বলেছেন 'আগে তুমি তোমার নিজেকে তোমাতে সমর্পণ কর, তারপর আমাতে করবে।' এর মানে কি? 'তোমার ভগবান তোমারই সৃষ্টি। তোমার আদর্শের যা চরম অভিব্যক্তি, সেইটি তোমার ভগবান। সেইজন্যে আগে সকল ক্ষুদ্রতার গণ্ডী অপসারিত করে, তুমি তোমার সব ছোট আমিকে তোমারই ভগবান বা তোমার বড় আমির কাছে সমর্পণ কর। তারপরে আমি নিজে অগ্রসর হয়ে এসে তোমাকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে নেব।

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ।

কাশীতে কয়েকটা দিন

শ্রী সোমনাথ সরকার

জঙ্গমবাড়ি থেকে হেঁটে গোধুলিয়া অবধি গিয়ে আবার একটা রিক্সায় চাপলাম ঠঠেরি বাজার যাওয়ার জন্য। রিক্সাওয়ালাকে বললাম ঠঠেরি বাজারে রাম ভাণ্ডার চল। রিক্সা প্রধান রাস্তার ওপর একটা জায়গায় এসে ছেড়ে দিল। গলিতে রিক্সা যাবে না। আঁকা বাঁকা গলি দিয়ে অনেকটা হেঁটে গিয়ে তারপর পেলাম রাম ভাণ্ডার। এই সেই বিখ্যাত রাম ভাণ্ডার যা বিখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যজিত রায় তাঁর "জয় বাবা ফেলুনাথ" সিনেমায় দেখিয়েছেন। ঠঠেরি বাজার রতনলাল কাটরায় অবস্থিত।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য অনেকটা বেলা হয়ে যাওয়ায় "রাম ভাণ্ডারের কচুরী শেষ। আমরা গেলাম ঠিক তার পাশেই "শ্রী নারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এ। দু প্লেট কচুরী অর্ডার দিলাম। এক এক প্লেটে দুটি করে বড় বড় গরম গরম কচুরী। ওদের ভাষায় উরুত কা দাল (কলাই এর ডাল) এর কচুরী। সঙ্গে ছোলে আর Mixed Vegetables দেওয়া একটা অনবদ্য তরকারী শাল পাতার বাটিতে। সঙ্গে Green চাটনি, ধনেপাতা পুদিনা পাতা দেওয়া আর টক টক তেঁতুলের চাটনি ঐ তরকারীর ওপর ছড়িয়ে দেওয়া। এক একটা কচুরী পঁচিশ টাকা করে। শুধু এই কচুরী তরকারীর জন্য বেনারসের গলিতে মাইলের পর মাইল হাঁটা যায়। যেহেতু নবরাত্রি চলছে, তাই আমরা সব সময় পেঁয়াজ রসুন ছাড়া নিরামিষ এর দোকানের খোঁজ করেছি।

যেহেতু বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষের অনেক জায়গায়ই পেঁয়াজ রসুনটাকে নিরামিষ ধরে, তাই আমাদের পেঁয়াজ রসুন ছাড়া দোকান খুঁজতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু রাম ভাণ্ডার আর শ্রী নারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এ বড় বড় করে লেখা "বিনা পেঁয়াজ লসুন কা। (No Onion No Garlic)" খাওয়া শেষ করে যখন পয়সা মেটাচ্ছি তখন আমি দোকানের অবাঙালি মালিক কে জিজ্ঞেস করলাম— "ভাইয়া মা সঙ্কটা মন্দির হিঁয়াসে কিতনা দূর হ্যায়?" মালিক বললেন, "বাস থোড়া হি দূরমে। সিধা চলা যাইয়ে। এক চক আয়েগা। উসিকা দাহিনে দোশো মিটার"

একটা জিনিসের পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। এবারে কাশীর অনেকগুলো অলি গলিতেই ঘুরে বেরিয়েছি।

কিন্তু এবারের কাশির গলি গুলোতে সেই যত্র তত্র গরু বা ষাঁড়ের দেখা পেলাম না। নেই এখানে সেখানে গোবর বা আবর্জনা পড়ে থাকা। গলির দেওয়ালগুলোতে রং দিয়ে বিভিন্ন দেব দেবী ও পৌরাণিক ছবি আঁকা। কাশী পাল্টাচ্ছে। শুনলাম কাশী ক্যান্টনমেন্ট থেকে গোধুলিয়া পর্যন্ত রোপ ওয়ে বা কেবল কার হবে।

মা সংকটা মন্দিরের গেটের উল্টোদিকে পুজো সামগ্রীর দোকানে চটি রেখে পুজো দেওয়ার সামগ্রী, মালা ইত্যাদি কিনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরে ঢোকার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলাম। সাদা কালো মার্বেল দিয়ে বাঁধানো প্রাঙ্গন। মধ্যিখানে একটি অশ্বথ গাছ। বেদি বাঁধানো। গাছের তলায় শিব লিঙ্গ। লাল রং দিয়ে বাঁধানো। আমরা গাছের তলায় শিবকে প্রণাম করে মা সংকটার গর্ভগৃহে প্রবেশ করলাম।

পুরাকালে নারদ ঋষি একবার জৈগীষব্য মুনিকে প্রশ্ন করেন মা সংকটার মাহাত্ম্য সম্পর্কে। মুনিবর বলেন

দ্বাপর যুগে বনবাসের সময় ঘুরতে ঘুরতে পঞ্চপাণ্ডবরা কাশীতে এসে পৌছোন। সেই সময় মহামুনি মার্কণ্ডেয় সশিষ্য কাশীতে ছিলেন। যুধিষ্ঠিরেরা মুনিকে পূজা বন্দনাদি করে নিজেদের কষ্টের কথা নিবেদন করেন। তখন মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরদের বলেন— ধবরেশ্বর শিবের উত্তরে ও চন্দ্রেশ্বর শিবের পূর্বদিকে সঙ্কটা নামে এক দেবী আছেন।

"আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিশ্রুতা
বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে চন্দ্রেশস্য চ পূর্বতঃ।"

সেই দেবী সংকটা কে পুজো করলে সকল কষ্টের নিবারণ হবে। দেবীর বার শুক্রবার। দেবীর আটটা নাম যিনি পাঠ করেন তিনি সকল বিপদমুক্ত হন।

দেবীর প্রথম নাম সঙ্কটা। দ্বিতীয় বিজয়া, তৃতীয় কামদা, চতুর্থ দুঃখহারিণী। পঞ্চম নাম শর্ব্বাণী, ষষ্ঠ কাত্যায়ণী। সপ্তম নাম ভীমবদনা এবং অষ্টম নাম সর্ব্বরোগহরা।।

এই দেবীকে এবং বীরেশ্বর শিবকে পূজা করলে সকল কষ্টের অবসান হয়।

মায়ের সোনার মুখটি কেবল দৃশ্যমান। সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্র ও মালায় আচ্ছাদিত। পুরোহিত মালা মা কে পরিয়ে প্রসাদ স্পর্শ করিয়ে ফেরত দিলেন। কয়েকজন ভক্তের অনুরোধে বস্ত্র একটু সরিয়ে মায়ের চরণখানি দেখালেন।

মায়ের গর্ভগৃহে একটু বসার নিয়ম। আমরা মায়ের সামনে মাটিতে মিনিট পাঁচেক বসে সঙ্কটা স্তোত্র পাঠ করলাম।

"কাশীতে কত মন্দির আছে ফেলুবাবু?"

"তেত্রিশ কোটি"

লালমোহনবাবু আর ফেলুদার এই বিখ্যাত কথোপকথন সত্যজিৎ রায়ের "জয় বাবা ফেলুনাথ" সিনেমায়।

সত্যিই কাশীর অলিগলিতে, বাড়ীতে, মন্দিরে কত যে ঠাকুর দেবতারমূর্তি আছে, গুণে শেষ করা যায়না।

আমরা মা শব্দটার মন্দির থেকে বের হলাম। পরবর্তী গন্তব্য আত্মবীরেশ্বর বা আত্মাবীরেশ্বর শিবের মন্দিরে।

আত্মবীরেশ্বর মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকেই বৃহপতিশ্বর মহাদেবের মন্দির। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক মন্দিরের দরজা বন্ধ। আমরা আত্মবীরেশ্বর মন্দিরের প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলাম। সুন্দর কারুকার্য করা পাথরের দ্বার। দ্বারের মাথায় লাল রঙের গণেশের মূর্তি। দ্বারের উপর হিন্দিতে লেখা রয়েছে "শ্রীশ্রী ১০০৮ শ্রী আত্মবীরেশ্বর মহাদেবজী।। কাশীখণ্ড উক্ত।। ঢুকেই বাঁ দিকে সন্তোষী মায়ের বস্ত্রাবৃত বিগ্রহ। ইনি আধুনিক কালের শুনলাম প্রতি শুক্রবার তাঁর কাছে ভীড় হয়। তার পরে একটু মার্বেল বাঁধানো চাতাল। চারিদিকে বারান্দা ঘেরা। এই কোণে লাল রঙের গণেশের মূর্তি। নাম মিত্র বিনায়ক। একটু এগিয়েই আত্মবীরেশ্বরের ছোট গোলাকার লিঙ্গ। চারিদিক রূপা দিয়ে বাঁধানো রূপার গৌরীপট্ট। গৌরীপট্টের গায়ে ছোট ছোট রূপার মুণ্ড খোদাই করা। মাথায় বিরাট পিতলের সাপ। এত ঝকঝকে যে সোনা বলে ভুল হতেই পারে। সামনে ছোট পিতলের নন্দী। ফুল মালা চড়ানো।

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত কাশীখণ্ডের এগারো এবং বিরাশী থেকে চুরাশী অধ্যায়ে আত্মবীরেশ্বরের আবির্ভাব কাহিনী বিস্তারিত বলা আছে। সংক্ষেপে বললে প্রাচীনকালে কাশীতে বিশ্বানর বলে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সন্তান কামনায় শিবের দর্শন লাভের জন্য কঠোর তপস্যা শুরু করেন। তের মাস ধরে কখনো খুব স্বল্প আহার করে, কখনো শুধু মাত্র জল পান করে কঠোর তপস্যা করেন।

তের মাস বাদে বীরেশ্বর আট বৎসর বয়স্ক অপরূপ বালক বেশে বিশ্বানর কে দিব্য দর্শন দিয়ে পুত্রলাভের বরদান করেন।

আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে স্বামী বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরীদেবীপুত্র কামনায় এই আত্মবীরেশ্বরের ব্রত পালন করেছিলেন কলকাতায় সিমলার বাড়িতে বসে। আর তাঁর এক কাশীবাসিনী আত্মীয়াকে দিয়ে প্রত্যহ বীরেশ্বরের কাছে পূজা পাঠাতেন।

বীরেশ্বরের অংশে জন্ম বলে স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য নাম ছিল বীরেশ্বর বা বিলে।

গর্ভমন্দিরের দেওয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের এবং মা ভবতারিণীর ছবি টাঙানো। আর এক পাশের দেওয়ালে রাবণ কৃত শিবতাণ্ডব স্তোস্ত্র মার্বেলের ওপর কালো তে লেখা।

এখনো বহু নারী যাঁদের সন্তান হচ্ছে না, বা হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা অল্প বয়সে মারা যাচ্ছে তাঁরা আত্মবীরেশ্বরের কাছে সন্তান কামনায় ব্রত পালন করেন।

আত্মবীরেশ্বর বা আত্মাবীরেশ্বরকে কাশী বিশ্বনাথের আত্মা বলা হয়।

মন্দিরে বেশ বড় লাইন নারী ও পুরুষের। বিশেষতঃ মহিলাদের।

তাঁরা হাতে পূজার ডালি নিয়ে গান করছেন—

"জয় অম্বে গৌরী মাঈয়া
তুমকো নিশিদিন ধ্যাওত।।
হরি ব্রহ্মা শিবজী।।"

আমার স্ত্রী বললেন— "শিবের মন্দিরে "জয় অম্বে" কেন?

আমি বললাম তার কারণ আজ চৈত্র নবরাত্রির ষষ্ঠী। আর ষষ্ঠীতে পূজিত কাশীর নবদুর্গার অন্যতম দেবী কাত্যায়নীর বিগ্রহ এখানেই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তো উল্লেখ আছেই "ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।"

ঘরের কোণে দারুণ সুন্দর কারুকার্য করা পিতলে বাঁধানো কুলুঙ্গি। তার মধ্যে দেবী-কাত্যায়নীর মূর্তি। যদিও পাথরের তবুও শুধু সোনার মুখটুকুই দৃশ্যমান। বাকীটা বস্ত্র এবং ফুল মালায় আচ্ছাদিত। সামনে পুরোহিত বসে। কুলুঙ্গির সামনে দানপাত্র রাখা আছে। তাতে আমরা প্রণামী দিলাম। প্রচুর অবিবাহিতা মেয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে

"ওঁ কাত্যায়ন্যৈ বিদ্মহে কন্যাকুমার্য্যৈ ধীমহি
তন্নো দুর্গি: প্রচোদয়াৎ ওঁ।।"

স্থানীয়দের থেকে শোনা গেল যে সমস্ত মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না বা বাধা আছে, তারা দেবী কাত্যায়নীর আশীর্বাদি হলুদ নিয়ে হাত থেকে কনুই পর্যন্ত পুরোটা মেখে গৃহে ফিরে যাবে এবং হাত ধুয়ে ফেললে চলবে না।

যাদের খুব বেশী বাধা তাদের এই ক্রিয়া টা টানা একচল্লিশ দিন করলে বিবাহ হবেই হবে।

গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দুটি ছোট ছোট তামা বাঁধানো কুণ্ডের মধ্যে কাশীখণ্ডের দুই প্রাচীন শিবলিঙ্গ। একটি মঙ্গলেশ্বর। অপরটি বুধেশ্বর। আমরা পাশে রাখা ঘটি থেকে জল নিয়ে শিবলিঙ্গে অর্পণ করলাম।

ক্রমশঃ

কর্মাবাই

শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীগুরুদেবের শুভ আবির্ভাব তিথিতে শ্রীশ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে শুরু করছি কর্মাবাই নামে এক পুণ্যবতী মহিলার ভক্তিকথা। কর্মাবাই নামে এক মহিলা ছিলেন পুরীতে। নিঃসন্তান ছিলেন তিনি। নিয়মিত মন্দিরে যেতেন। তাঁর প্রতিদিনের কাজ ছিল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করা। ধীরে ধীরে পুত্রজ্ঞানে শ্রীজগন্নাথদেবকে স্নেহ করতে থাকেন। দর্শনের সময় তিনি নিয়মিত বিবিধ ফল নিয়ে যেতেন, জগন্নাথদেবকে নিবেদন করে ফিরতেন। একদিন পুজো শেষ করে তিনি খিচুড়ি রান্না করছেন। রান্না করে তাঁর মনে হল প্রতিদিন ফল নিবেদন না করে, যদি রান্না করা খিচুড়ি শ্রীজগন্নাথদেবকে নিবেদন করা যায় মনে হয় তাঁর ভালো লাগবে।

যেমন ইচ্ছে তেমন কাজ। মনে মনে শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্তির সামনে তিনি খিচুড়ি নিবেদন করলেন। ঠিক সেই সময় একটি গায়ের রং কালো, বালক প্রবেশ করল ঘরে। বল্‌ল, "খুব খিদে পেয়েছে; কিছু খেতে দাও। কর্মাবাই অপলক দৃষ্টিতে বালকটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। যন্ত্রচালিতের মতো একটি আসন পেতে তাকে বসতে দিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবকে নিবেদন করা খিচুড়ির থালাটি বালকটির দিকে এগিয়ে দিলেন। বালকটি পরমানন্দে খেয়ে চলেছে খিচুড়ি, আর পাশে বসে পাখার বাতাস করে চলেছেন কর্মাবাই— যাতে গরম খিচুড়ি খেতে কোনো অসুবিধে না হয়। সেই প্রসাদ খেয়ে খুবই তৃপ্ত হল বালক। বলল সে প্রতিদিন এরকম খিচুড়ি খেতে চায়। কর্মাবাই মাথা নাড়লেন। বালকটি বলে গেল প্রতিদিন সে সকাল সকাল খিচুড়ি খেতে আসবে। কর্মাবাই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন— একটি মোড়ের মাথায় বালকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকে কর্মাবাইয়ের সময় কাটে না। তার খালি মনে হতে থাকে কখন সকাল হবে, কখন তিনি রান্না করবেন, কখন সেই বালক আসবে— তিনি খেতে দেবেন, পাখার বাতাস করবেন। দু'চোখ ভ'রে তাকে দেখবেন, সেবা করবেন— মহানন্দ লাভ করবেন। পরদিন উঠে কর্মাবাই সবকাজ ফেলে উনুন ধরালেন শুরু করলেন রান্না। মনে চিন্তা করলেন যেন ভাল হয় ঠাকুর। জগন্নাথ তুমি সহায় হও। তোমায় নিবেদন করে বালকটিকে প্রসাদ দেব। আজ ও যেন অবশ্যই আসে। কোনোদিকে কর্মাবাইয়ের খেয়াল নেই। সে এক মনে প্রার্থনা করতে করতে রান্না করে চলেছে। একটি থালায় ভোগ রেখে শ্রীজগন্নাথ দেবকে নিবেদন করলেন। প্রসাদ নিবেদন শেষ হতেই হাজির হল সেই বালক। বালকটিকে দেখে যেন ধরে প্রাণ এল কর্মাবাইয়ের। আসন পেতে বসতে বলে পাখা নিয়ে এলন। প্রসাদ দিলেন। বালকটি খেয়ে চলেছে— তিনি আশ মিটিয়ে দেখছেন। আহা কী অপূর্ব বালক— কী অদ্ভুত মুখশ্রী। খাওয়া শেষ। বালকটি চলে যাচ্ছিল— কর্মাবাই আটকালেন তাকে, কাল আসবে তো? বালকটি সম্মত হল। এরকম করেই কর্মাবাইয়ের দিন কাটে। কর্মাবাইয়ের প্রতিদিনের কাজ হচ্ছে সকালে উঠেই

রান্না করা। শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ নিবেদন করে বালকটিকে খেতে দেওয়া।

এরপর সারাদিন কাটে খিচুড়ির মালমশলা জোগাড়ের, উনুনের জ্বালানি সংগ্রহে। কোথা দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে বুঝতেই পারছেন না কর্মাবাই। শুধু বালকটির উজ্জ্বল মুখটাই চোখে ভাসে। কর্মাবাইয়ের মনেতো আনন্দ ধরে না। প্রতিদিন এই কাজে মেতে থাকায়— দীর্ঘদিন আর মন্দিরে যাওয়া হয়না কর্মাবাইয়ের। এরকম করেই চলছিল। মন্দিরের এক পূজারী তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এখন মন্দিরে কর্মাবাইকে দেখা যায়না। কথায় কথায় বললেন কর্মাবাই তাঁর সারাদিনের কাহিনী। শুনে সেই পূজারী বললেন— স্নান করে, পরিষ্কার পোশাক পরে যেন তিনি রান্না করেন। যতই হোক শ্রী জগন্নাথদেবকে ভোগ নিবেদন করছেন, শুচিতা প্রয়োজনীয়। শুনে কর্মাবাই খুবই দুঃখিত হলেন। এতদিন ধরে তাহলে বাসি কাপড়ে রান্না করে ভোগ নিবেদন করেছেন শ্রীজগন্নাথদেবকে? মনে মনে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

পরেরদিন তিনি সকালে উঠে স্নান করলেন। তারপর পোশাক পরিবর্তন করে রান্নায় বসলেন। এইসব করতে করতে অনেক বেলা হয়ে গেল শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ নিবেদন করতে। অবশেষে সেই বালক এলো, তার মুখ শুকিয়ে গেছে। এদিকে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নিবেদন করলেন নৈবেদ্য। তিনি দেখলেন নৈবেদ্য থেকে সুগন্ধ আসছেনা— শ্রীজগন্নাথদেবতো তাহলে নৈবেদ্য গ্রহণ করলেন না। কি অন্যায় হয়ে গেল ভেবে ভেবে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন তিনি। অবশেষে দেখলেন, শ্রীভগবানের মুখে লেগে রয়েছে খিচুড়ি। তিনি ধ্যানে বসলেন। সব জানতে পারলেন। ধ্যান থেকে উঠে সেই পূজারির সঙ্গে ছুটলেন কর্মাবাইয়ের ঘরে। সব খুলে বললেন। খুবই চমৎকৃত হলেন কর্মাবাই। তাহলে বালকটি শ্রীজগন্নাথদেব নিজেই। আনন্দে দুচোখে ধারা নামল। পূজারিদের অনুরোধে এরপর থেকে প্রতিদিন তিনি সকালে উঠে মন্দিরের রান্নাঘরে গিয়ে খিচুড়ি রান্না করতেন— শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে।

আজও সকালে নিবেদন করা হয় খিচুড়ি। বালকভোগের একটি জরুরি পদ হচ্ছে এই খিচুড়ি। কর্মাবাইয়ের পুরো নাম ভক্তশিরোমণি কর্মাবাই। আসলে তিনি ছিলেন জাঠ। নাগপুরে তাঁর জন্ম ১৬১৫ সালের ২০শে জানুয়ারী। তিনি ছিলেন আজন্ম কৃষ্ণভক্ত। পরে পুরীতে তিনি আসেন। ভগবানের জন্য খিচুড়িসেবা করতে থাকেন তিনি বাকী জীবন। মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে তাঁর পুরীতে মৃত্যু হয়। সালটা ১৬৩৪ এর ২৫ এ জুলাই। মন্দিরের অদূরেই তিনি সমাধিস্থ। তারপর থেকে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় রথ এসে দাঁড়িয়ে যায় তাঁর সমাধির কাছে। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে আটকে যায় চাকা। তখন রথ নড়ানো যায় না। একটু পরে আবার রথ চলতে থাকে। বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ তথা শ্রীজগন্নাথদেব তাঁর ভক্তের দর্শন করেন। পরম করুণাময় নারায়ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে জানাই অন্তরের অনন্ত কোটি প্রণাম।

জয় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী কী জয়।

আমাদের মহারাজ

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল

"জয়গুরু বলে যাত্রা শুরু করো
সকল কাজের আগে গুরুর চরণ যুগল ধরো..."

প্রকটকালে কোলকাতায় জন্মোৎসব হয়ে যাবার পর বেশ কয়েকবছর ধরে গুরুমহারাজজী একটানা বিন্ধ্যাচলে শ্রদ্ধেয় তুষার কান্তি ঘোষের বাগানবাড়িতে গিয়ে অবস্থান করতেন। বেনারসে যেহেতু সেই সময়কালে আমাদের বাড়ি ও ফ্যাক্টরি ছিল, তাই আমরা কোলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে বেনারস হয়ে বিন্ধ্যাচলে পৌঁছতাম প্রায় পরিবারের সকলেই বলা যায়।

সে এক অনাবিল আনন্দের দিন ছিল। থাকা খাওয়া, চা, প্রাতঃরাশ এ সমস্ত কিছুরই ব্যবস্থা রাখতেন গৃহস্বামী। কী সুশৃঙ্খলভাবে যে দায়িত্ব প্রাপ্ত দাদাভাই, দিদিভাইরা সমস্ত কিছু নিখুঁত ভাবে পরিচালনা করতেন সে কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আমার তখন বয়স অনেক কম আর ছেলেও ছিল খুব ছোট। তখন মনেরভাব এমন ছিলনা অথবা উপলব্ধিবোধও সেই রকমভাবে পরিণত হয়নি, কোলকাতার কোলাহলের থেকে অপেক্ষাকৃত কম ভীড়ে স্বয়ং গুরুমহারাজজীর সান্নিধ্য পাব, আমার সন্তান তাঁর আশীর্বাদ বেশি বেশি পাবে এইসমস্ত লোভেই বহু উৎসাহে ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে যেতাম।

তখন কী আর তিনি আমাকে সেই বোধ দিয়ে ছিলেন যে বুঝতে পারবো তিনি স্বয়ং জীবন্ত ভগবান, যাঁর জন্ম নেই মৃত্যুও নেই। এনাকে ভগবান বললেও বোধ করি ছোট করা হয়। অমাদের তরফ থেকে কীইই বা তাঁকে দেবার ছিল? শুধু নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ছাড়া। তিনি যে প্রেমের ভিখারি। "কতগানে কতসুরে নিশিদিন", তিনি কতকিছু বলে গেছেন—

"আধ জনম হাম, নিঁদগোঙায়নু
জর শিশু কতদিন গেলা,
যৌবন আওচ রসরঙ্গে মাতুন
তোহে ভজব কোন বেলা।"...

আজ যখন সেইসব স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে ওঠে মনে হয় যেন বড় দেরী করে ফেলেছি। এখন "আয়ু সূর্য্য মোর বসিতেছে পাটে"... কোথা ব্রহ্মময় থাকো মোর সাথে।

ফিরে আসি সেসব দিনের বর্ণনায়।

ভোরবেলায় গুরুমহারাজজী ফুলের বাগানে পায়চারী করতেন, আমরাও তাঁর সঙ্গী হব বলে সকাল

সকাল স্নান করে ছুটে আসতাম। কতদিন আমার ছেলের মাথায় হাতের ভর দিয়ে হেঁটেছেন। ওখানে গুরুমহারাজজীর ঘরের দরজা সবসময় খোলা থাকত, একমাত্র ওনার বিশ্রামের সময় ছাড়া। আমরাও মাঝে মধ্যেই ঢুকে পড়তাম, দেখতাম উনি পুজো করছেন।

যেখানে উনি এসে প্রণামে বসবেন, সেইখানটায় কুঁচো-ফুল ও পাপড়ি দিয়ে গুরুবোনেরা সুন্দর করে তাঁর শ্রীচরণ রাখার জায়গায় আল্পনা দিয়ে রাখতেন।

সেই সময় ওখানে বর্ধমানের কমলাদি, শ্রদ্ধেয়া রেণুদি, সতীদি, পেতিদি (যাঁকে মহারাজ পেত্নি বলতেন), ছায়াকাকীমা ও কাকু বণ্ডেলরোডের গীতামা, তাঁর ভাই এর স্ত্রী আরও অনেকেই যেতেন। রেণুমার কথা বড্ড মনে প'ড়ে যাচ্ছে; হাতে একটা বড় ঘড়ি পরতেন। কেউ যদি ওখানে সাংসারিক কথা বলেছে ওনার কানে যেত তাহলে তাকে একেবারে তুলোধোনা করে দিতেন। হেনা মাসীমার সর্বক্ষণই খেয়াল থাকত গুরুমহারাজজী কীভাবে বসলে তাঁর কষ্ট কম হবে।

অজিতদা, কস্তুরিদি এঁরাও আমন্ত্রিত থাকতেন হারমোনিয়ামে সঙ্গত করার জন্য। সেই সময় গুরুমহারাজজী ছোট ছোট কিছু মজার কথা বলতেন, যা শুনে আমরা স্তব্ধ হয়ে যেতাম।

মহারাজজী বলতেন, "তোমরা সবাই খেয়ে এসে বোসো; না খেলে বাড়ির লোকেরা আটকে থাকবে আর ওরা কীর্তন আসরেও যোগ দিতে পারবে না, আরও বলতেন "তোমাদের ভাত খাওয়া কাপড় বলে চিন্তা কোরোনা, আমি সবার প্রণাম নেব।" কতদিন নিজে পায়েস অথবা মিষ্টি পরিবেশন করেছেন। আবার একদিন সবাইকে খেতে পাঠিয়ে তারপর বলে দিচ্ছেন— "দেখো পরের পেয়ে যেন বেশি খেয়োনা"... সবাই আমরা হেসে উঠেছিলাম বটে, তবে এইসবের মাধ্যমে কত ছোট ছোট শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

তারপর সবাই এসে বসলে, উনি প্রণাম নিতেন, প্রণাম শেষে হত কীর্তন, তারপর লুঠ— কী মজা যে হত। একদিন একটা বিশাল বড় নারকোল হাতে তুলেছেন, আমরা ভাবছি কার হাতে দেবেন— দেখি না ওটা উনি ছুঁড়বেন; আমার বড় জা বেশ অনেকটা দূরে দাঁড়িয়েছিলেন, সটান সেটা গিয়ে পড়ল ওনারই হাতে।

আবার বিকেল গড়ালে কাছাকাছি কারও বাড়ি শ্রীচরণধূলি দিতে যেতেন; আমরাও প্রস্তুত থাকতাম। পাহাড়ি রাস্তা, এবড়ো-খেবড়ো, হাতে লাল রঙের বড় টর্চ নিয়ে গুরুমহারাজ হাঁটছেন, ওনার হাঁটা মানে আমাদের দৌড়ানো। সন্ধে হলেই আবার ফিরে আসা।

গুরুমহারাজজী চলে যেতেন আহ্নিক করতে আর এদিকে সবার জন্য প্রোজেক্টারে ভিডিও দেখানোর ব্যবস্থা থাকত। বেশিরভাগই ওনার তীর্থে তীর্থে ঘোরার ভিডিও। সর্বত্রই উনি খালি পায়ে। আজ অনুভব করি কতইনা তিনি "আপনি আচরি ধর্ম পরকে" শেখানোর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, স্বয়ংভগবানের কী এসব কিছুর দরকার ছিল?

যাইহোক আবার গুরুমহারাজজীর জয় দিয়ে তাঁকে এনে কীর্তনের আসরে বসানো হত। আমি একদম পাশে ছোট হয়ে বসে থাকতাম। হয়তো তিনি কাশছেন, একটু গরমজল চাই, নয়তো একটু লবঙ্গ; গায়ত্রীমা যেরকম বলতেন। অন্ধকারে কীর্তন, কচিকাঁচাগুলো সব ঘুমিয়ে পড়েছে পাশে একটা খাট আছে সেখানে তাদের শুইয়ে রাখা হয়েছে। ঘর অন্ধকার, গুরুদেব একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছেন,

আমরা সবকিছু ভুলে গানে ডুবে আছি। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল আর গুরুমহারাজজী বড় কড়তাল নিয়ে 'গৌর হরিবোল' গাইতে গাইতে দাঁড়িয়ে উঠে লুঠ দিতে দিতে এগিয়ে চললেন। শান্তির জল দেওয়া যেই শুরু করতেন ধলুদা বুকের পাঞ্জাবীটা খুলে ধরতেন মহারাজজী এক পিচকারি জল ওনার বুকে দিয়ে ভিজিয়ে দিতেন।

সাধারণতঃ ফিরে আসার আগের দিন রাতের কীর্তনে মহারাজজী সব বিদায়ের গানগুলো গাইতেন, "দাও মোরে বিদায় চলে আমি যাই", "চলিগো চলিগো যাইগো চলে"... আমরা সবাই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদতাম। আলো জ্বললে দেখতাম "সবার চোখে জল"।

গুরুমহারাজজী সবসময় ওখান থেকে ফিরতেন ভোরবেলায়। সেইমত গাড়িতে যাঁরা থাকতেন তাঁদের জন্যও রাত জেগে খাবার তৈরি করে গুছিয়ে রাখা হত আর এই ব্যাপারে গায়ত্রীমা সবসময়েই অনেক সহযোগিতা করতেন। বছর বছর অনেক অভিজ্ঞতা পরে সবলেখার ইচ্ছা রইল। একবার গুরুদেব যখন সকাল সকাল রওনা হবেন আমাদের আসতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমরাতো ওনাদের গেস্টহাউসে থাকতাম। তাড়াহুড়ো করে জয়গুরু বলতে বলতে যাচ্ছি, হঠাৎ আমাদের রিক্সার পাশে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। দেখি মহারাজজীরই গাড়ি। উনি দরজা খুলে শ্রীচরণদুটি বাড়িয়ে দিলেন, আমরা প্রণাম করলাম। উনি আশীর্বাদ করলেন। এইসব কথা আজকাল সবই গল্প—

"আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে,
তখন কে তুমি তা কে জানত..."।

বর্তমানে আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছি তা অতি ভয়াবহ। তাইতো আমরা আবার পূর্ণিমার আলোতে পূর্ণচন্দ্রকে দেখব বলে দিন গুণছি—

"তুমি আবার আসিবে, জগত মাতাবে,
শান্তিধারা বুঝি হবে বরিষণ।"

"প্রেম ও আনন্দই মানুষকে অপরের সঙ্গে যুক্ত করে,
আত্মবিসর্জন দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে দ্বেষভাব
মানুষকে স্বার্থবিমূঢ় করে, রাগ-হিংসা-আঘাতের জন্য
উদ্বুদ্ধ করে— প্ররোচিত করে।"

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

বৃক্ষোৎসব (২)

শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক

এই লেখাটি আগের লেখাটিরই ধারাবাহিক অংশ। গাছকে ঘিরে আগেও মানবজীবনে উৎসব পালন করা হোত এবং এখনও কোনও কোনও ক্ষেত্রে উৎসব হয়ে থাকে।

মানবজীবনে গাছের বিশেষ প্রাধান্য ছিল, মানুষের যে আবাসস্থল তার প্রধান উপকরণই ছিল কাঠ, বাড়ি বা অন্য কিছু নির্মাণের জন্য গাছ কাটার এক বিশেষ নিয়ম ছিল; কাটার আগে বিশেষ গাছটিকে পরীক্ষা করা হত যে সে নির্মাণযোগ্য ও যথেষ্ট পরিপূর্ণ হয়েছে কিনা। একটি ভালো দিন দেখে গাছটিকে পুজো করে তার কাছে কাটার অনুমতি চাওয়া হোত। কাটবার সময় গাছটি উত্তরপূর্বকোণে পরলে শুভ আর দক্ষিণদিকে পরলে অশুভ মানা হোত। যে গাছে অনেক পাখি বাসা বেঁধে আছে অথবা আগুন বা বাতাসে কিছু ডাল ভেঙে পরেছে সেরকম গাছ বাড়ির জন্য ব্যবহার করা যাবেনা এমনটাই মানা হোত। দুই নদীর সংযোগস্থলে, জলাশয় বা মন্দিরের কাছে, শ্মশানের ধারের গাছও বাড়ির কাছে লাগানো যাবে না।

এতো গেল গাছের ব্যবহারের কথা, এবার তাদের ঘিরে যে উৎসব পালন করা হোত তার কথা বলি।

বিশেষ কোনও শুভদিনে নির্দিষ্ট দুটি গাছকে নানারকম সুগন্ধি জল দিয়ে স্নান করানো হোত। তারপর সোনার সূঁচ দিয়ে বাচ্চাদের কানবেঁধানোর মতো করে কান বেঁধানো হত এবং সোনার শলাকা দিয়ে কাজলও পরানো হোত।

"সূচ্য সৌবর্ণয়া কার্যং সর্বেষাং কর্ণবেধনম্।
অক্রুনঞ্চাপি দাতব্যং তদ্বদ্ধেমশলাকয়া।।'

মৎস্য পু অ ৫৯ শ্লো ৫

(সোনার সূচ দিয়ে সকলের (গাছের)
কান বেঁধানো হবে, সেইরকমই সোনার কাঠি দিয়ে কাজলও পরিয়ে দিতে হবে),

এরপর বিবিধ উপাচারে তাদের পুজো করে মাল্য বস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করা হোত প্রতিটি গাছের জন্য সাত বা আটটি ফল নৈবেদ্য হিসেবে রেখে, তাম্রপাত্রে গুগ্গুল, ধূপ জ্বালিয়ে প্রতিটি বৃক্ষের কাছে একটি করে পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করা হত। ব্রাহ্মণেরা হোমকার্য্য করে যথাবিধি পুজো করতেন। সাতদিন ধরে এই পুজো চলতো।

পরিশেষে এও বলা হয়েছে যে যারা এরকমভাবে বৃক্ষোৎসব করবে তাদের সকল মনোষ্কামনা পূর্ণ হবে। যদি কোনও ব্যক্তি একটি গাছও রোপণ করে তবে সে স্বর্গে অযুত বর্ষ বাস করবে।

এতো গেলো সেকালের কথা এবার একালের কথা একটু বলি। কয়েকবছর আগে আমরা জলপাইগুড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম আজ নদীর ধারে মন্দিরের কাছে বট পাকুড়ের বিয়ে হবে। কৌতূহলী হয়ে আমরাও ছুটলাম; তখন বিকেলবেলা, গিয়ে দেখি মন্দিরের কাছে পাশাপাশি দুটো বড় গাছ— একটিতে সাদা ধুতি জড়ানো অন্যটিতে লাল শাড়ি। মাটিতে আলপনা, ঘট ও পুজোর নানা উপাচার, সকালে একপ্রস্থ পুজো হয়ে গেছে; রাতে বোধহয় আবার হবে। সকলে মিলে আনন্দ করে খিচুড়ি প্রসাদ খাচ্ছে। আমরাও খেলাম। এই পুজো উপলক্ষ করে মানুষের মিলন-মেলাও হোল।

আবার হাম্পিতে বেড়াতে গিয়ে তার কাছাকাছি যে হোটেলে উঠেছিলাম সেখানেও প্রাঙ্গণের একধারে বিশাল গাছ, চারদিকে তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। তারও গায়ে নানারকম সুতো ও কাপড় জড়ানো নীচে বেদিতে প্রদীপও জ্বলছে। হয়তো ওখানেও গাছকে পুজো করা হয়। খবরের কাগজে একটা খবর নজরে এল যে দাক্ষিণাত্যের কোন বনে একটি পূর্ণ বয়স্ক চন্দন গাছ মারা গিয়েছে। তাকে যথাবিধি পুজো করে তারপর তার গায়ে কুঠারের আঘাত করা হোল।

এসব দেখে মনে হয় আমাদের এই যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যেও বৃক্ষদেবতা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

জন্মতিথি স্মরণে প্রণাম

শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় (পুনঃপ্রচারিত)

প্রভু, তব জন্মদিনে শত শত ভক্তজনে
এনেছে ভরিয়া ডালা কত না কুসুম মালা।
তোমার চরণে 'দেব', কী দিয়েপূজিব আমি!
কী অর্ঘ্য তোমারে দেবো, ভাবি তা দিবসযামী।

সকলই তোমার আছে, আমারতো কিছু নাই,
কী দিয়ে করিব পূজা-মনে মনে ভাবি তাই।
আমারে জানালে তুমি-পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ
ও চরণে সঁপে দিনু অপূর্ণ এ দেহ-মন।

পুণ্যপরশ-পুলক (১৭শ পর্ব)

শ্রীবসুমিত্র মজুমদার

একবার কোলকাতায় গুরুমহারাজকে প্রণাম করতে এসে দেখলাম, মহারাজের ব্যবহার করা কাপড়, পাদুকা ইতাদি বিক্রি হচ্ছে। তাঁদের উদ্দেশ্য এগুলো থেকে কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করে বিভিন্ন খাতে তা ব্যয় করা। তখনই গুরুমহারাজের অনেক আশ্রম এমনকি বেহালার হাসপাতাল পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেছে। সেই সমস্ত আশ্রমের এবং হাসপাতালের জন্যে অর্থ সংগ্রহের উপায় হিসাবে কমিটি ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

স্টলে অনেকেই আসছেন, কেউ হাতে নিয়ে দেখছেন, কেউ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ ধরে স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে সামনে এগিয়ে গেলাম। কাপড়, সেন্ট, ব্যবহার করা ক্রীম, স্নো, পাদুকা কত কী রয়েছে। খুব ইচ্ছে করতে লাগল পাদুকা সংগ্রহ করার। গুরু মহারাজের লাল মেরুন, খয়েরী, নীল, হলুদ নানা রঙের পাদুকা রয়েছে। এগুলোর ওপর হাত বোলাতেও বেশ ভাল লাগত। কেনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দেখলাম পাদুকার সামনে লেখা আছে ৫০্ টাকা। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ৫০্ কোথায় পাব? বাড়ি থেকে আসার সময় একটা মালা দুটাকা, গাড়িভাড়া দুটাকা আর গুরুমহারাজজীকে প্রণামী দেবার দু টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ যখন দেখতাম দশটাকা, পঞ্চাশটাকা, একশো টাকা গুরুমহারাজকে দিচ্ছেন, আর তারপরেই আমি দেব দুটাকা! কাজেই টাকাটা হাতে মুড়ে গুরুমহারাজের হাঁটুর কাছে রাখার চেষ্টা করতাম। উদ্দেশ্য ছিল দুটো। প্রথমতঃ তাঁকে স্পর্শ করা আর দ্বিতীয়ত প্রণামী হিসাবে দু টাকার লজ্জা থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

স্পর্শ করার জন্য একটা ব্যাকুলতা আমার ছিল, কেননা, মায়ের কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম—একবার স্বর্গে ভুল করে একটা লোক পৌঁছে গেছে। তাকে তাড়াবার জন্য সকলে যখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন দিশাহীন হয়ে ছুটতে ছুটতে সে এসে পড়েছে নারায়ণের শ্রীচরণ প্রান্তে। যমদূতরা নারায়ণকে দেখে থমকে গেল। শ্রীনারায়ণ বললেন, 'ব্যাপারটা কি?' যমদূত বললো, ইনি ভুল করে এসে গেছেন। এঁর নরকে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেখানে উনি যেতে চাইছেন না।' নারায়ণ বললেন, 'দেখ, তোমাকে তো সেখানেই যেতে হবে। তুমি চলে যাও।' লোকটি বললো, 'আমি আপনার কাছে থাকতে চাই।' নারায়ণ বললেন, 'অসম্ভব, তা হয় না।'

এরপর বিস্তর বাদানুবাদ সেরে লোকটি শ্রীভগবানকে বললো, 'ঠিক আছে প্রভু আমি চলে যাচ্ছি। তবে তার আগে আমার দুটো প্রশ্ন আছে।'

প্রভু বললেন 'বলো'।

লোকটি বললো, 'আপনাকে দর্শন যিনি করেন, তিনি কী ফল পেয়ে থাকেন?

প্রভু বললেন, 'তাঁর অনন্তকাল স্বর্গে অবস্থান সুনিশ্চিত হয়।'

লোকটি বললো আর, 'আপনাকে যিনি স্পর্শ করেন?'

প্রভু বললেন, তিনি অনন্তকাল আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে কাল যাপন করেন।'

এবার লোকটি বললো, 'প্রভু, তবে আমার কি হবে? আমি আপনাকে দর্শন করেছি, আর এখন আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ করেই আছি।'

শ্রীভগবান তখন স্মিত হেসে যমদূতদের বললেন, 'ওহে, তোমরা ফিরে যাও, এ, এখন থেকে বৈকুণ্ঠে আমার কাছেই অবস্থান করবে।'

মায়ের কাছে এই গল্প শোনার পর থেকেই গুরুমহারাজকে প্রণাম করার সময় কৌশল করে স্পর্শ করার চেষ্টা করতাম। যেহেতু সাক্ষাৎ নারায়ণকে দর্শন এবং স্পর্শ করলে জীবনের সমস্ত পাপের অবসান হয়ে যাবে। তাই মালাটাও তিনি যখন হাত বাড়িয়ে নিতেন, তখনও চুরি করে তাঁর হাঁটু স্পর্শ করে নিতাম।

যাক, যে কথা বলছিলাম। সেই পাদুকার কথা ইচ্ছে থাকলেও পয়সার অভাবে সেদিন তা কিনতে পারিনি। কিন্তু লীলাময়ের লীলাবোঝে সাধ্য কার। যাকে দিয়ে যা করিয়ে নেবার তিনি তা করিয়েই নেন।

একদিন আমার চেম্বারে বসে কাজ করছি, এমন সময় একজন সহপেশাবলম্বী মানে জ্যোতিষী দিদি এলেন সে সময় আমার চেম্বার ছিল কলেজস্ট্রীটের কাছে। কালে ভদ্রে ওই দিদি কোনো বই কিনতে এদিকে এলে, আমার সঙ্গে দেখা করে যেতেন। একদিন এমনই এসে একথা ওকথা বলার পর বললেন আমার কাছে আপনার গুরুদেবের পাদুকা আর পৈতে আছে। নেবেন?' বললাম, 'কবে দেবেন?' তিনি বললেন, 'পরে যেদিন আসব সেদিন দিয়ে দেব।'

এরপর তিনি বলতে লাগলেন, যেহেতু তিনি শ্রীশ্রীরামঠাকুরাশ্রিত। সেই কারণে আমাদের গুরুদেবের পাদুকা তিনি যথাযথভাবে সেবা করতে পারছেন না। নিজের মনেই অপরাধ ভোগে ভুগছেন। তাই শ্রীগুরুচরণাশ্রিত ভক্তের কাছেই তিনি ওটা দিয়ে দিতে চান।

তিনি আরও বললেন— কোনও এক ভক্তের বাড়ি একবার গুরুমহারাজ এসেছিলেন। তাঁদের কাছে অবস্থানকালে তাঁরা শ্রীগুরু চরণসেবায় একজোড়া খড়ম দিয়েছিলেন। কৃপাসিন্ধু সেই খড়ম পরেই তিনদিন সে বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন তিনি চলে যাবার পর এই দিদি তাঁদের বাড়ি থেকে খড়ম জোড়া নিয়ে এসেছিলেন। সেই পাদুকাই তিনি দিতে চান আমাকে।

মনে মনে ভাবলাম, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। কার বাড়িতে তিনি পাদুকা পরে কাটিয়ে ছিলেন সেই পাদুকা তাঁর অসীম কৃপায় তিনি আমার কাছে পাঠাতে ইচ্ছা করেছেন। যাইহোক, মাস দুয়েক পর, ওই দিদি পাদুকাজোড়া একটা লাল শালুতে মুড়ে নিয়ে এলেন। আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আজ আমি নিশ্চিন্ত হলাম।'।

ওই সঙ্গে দিলেন গুরুমহারাজের ব্যবহার করা একটি পৈতে। বললেন, 'এই পৈতেতে আপনার গুরদেবের একটা রোম জড়ানো ছিল। ওইটা আর আপনাকে দিলাম না। আপনি এই পৈতেকে নিয়ে যান।'

মহামূল্য সম্পদ যেদিন বাড়ি নিয়ে এলাম বাবা বললেন, 'গুরু মহারাজের পৈতেকে উপোসী রাখা ঠিক হবে না।' তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন রোজ ওই পৈতের ওপর গায়ত্রী জপ করতেন। তাঁর আবর্তমানে সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছি।

ক্রমশঃ

স্মৃতির আলোকে বিগতদিন

শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র

সাধকেরা যে শীত গ্রীষ্ম জয় করার সামর্থ রাখেন সে তো মহারাজজীকে দেখে বুঝেছি। আমি আমার আগের খণ্ডে লিখেছি Italy-র Alps পর্বতে একটা ছবিতে দেখেছিলাম Mrs. Sabita Chatterjee ও তাঁর পুত্র সুদাম মহারাজজীর দুই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছেন গরম জামায় সর্বাঙ্গ আবৃত করে। কিন্তু মহারাজজীকে সেই ছবিতে দেখেছিলাম তখন যে বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করতেন সেই সূতার গেরুয়া গায়ে জড়ানো। শীত বস্ত্রের লেশ মাত্র সে অঙ্গে দেখিনি।

এই শীত জয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলাম আর একবার বদরীনাথে নভেম্বর মাসে যখন মহারাজজী কৃপা করে আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন বদরীনাথে আমাদের তীর্থাশ্রম উদ্বোধনের সময় নভেম্বর মাসে। মনে আছে সে সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আগের কদিন প্রচণ্ড তুষারপাত হয়ে গেছে। তীর্থাশ্রম উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মহারাজজী বহু সাধু মহাত্মাকে দান করেছিলেন ও বহু সাধু সেই দান গ্রহণ করতে আমাদের তীর্থাশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে এসেছিলেন একজন সাধু কিন্তু সবিস্ময়ে দেখেছিলাম তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নগ্ন গাত্র। বিস্মিত হয়েছিলাম তখন। আমার ধারণার বাহিরে ছিল যে ঐ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কেউ নগ্ন দেহে ঘরের বাইরে থাকতে পারেন। মহারাজজীর কাছে এসে দান গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজজী তাঁর গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই সাধু দানের সমস্ত সামগ্রী দুহাতে গ্রহণ করে নামিয়ে দিয়েছিলেন মহারাজজীর শ্রীচরণের পাশে ও জোড় হাতে মহারাজজীকে প্রণাম জানিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন মন্দিরের পথ ধরে।

সেই সাধুর সেই ঠাণ্ডায় নগ্ন গাত্র আমাদের তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহলী করে তুলেছিল। আমরা মহারাজজীর চরণতলে বসে কীর্তন করছিলাম কিন্তু সেখান থেকে মন্দিরের পথ পুরো দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। মনে আছে সেই মন্দিরের পথে বসে ছিল বহু ভিক্ষুক ভিক্ষার আশায়। অবাক হয়ে দেখেছিলাম যে মন্দিরের পথে যেতে যেতে সেই সাধু একটি ভিক্ষুকের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন ও নিজের গায়ে জড়ানো কম্বলটি খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। পুনরায় নগ্ন গাত্রেই তাঁকে মন্দির পানে চলে যেতে দেখেছিলাম। এর সম্বন্ধে আমার পুস্তকের পূর্বের কোন খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে।

মনে মনে শুধু চিন্তা করেছিলাম যে মানুষ সাধনার বলে কত শক্তি লাভ করতে পারে যাতে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় নগ্ন গাত্রে কোন কষ্ট পান না বা সেই গাত্র ঢাকার উপকরণ হাতে পেয়েও তা অম্লানবদনে দান করে দিতে পারেন? এর পরে হাতে পড়েছিল শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের একখানি গ্রন্থ নাম পঞ্চকেদার। তাতেও এইরূপ এক সাধুর উল্লেখ করেছেন তিনি। সেই সাধুর ছিল একেবারে নগ্ন শরীর। তিনি লিখেছেন যে তিনি স্বয়ং তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি একান্ত শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি। আমাদের এই

ভারতবর্ষে সাধকেরা যে সাধনার বলে নিজেদের কিভাবে তৈয়ারী করেন বা কোন স্তরে নিজেদের উন্নীত করেন তা উমাপ্রসন্ন বাবুর লেখার মধ্যে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করে সেই কাহিনীর সারাংশ এখানে উল্লেখ করে গেলাম সকল পাঠকের অবগতির জন্য যে আমাদের দেশে এখনও ঐ পাহাড় পর্বতে সাধনারত বহু সাধু, বহু সন্ন্যাসী আছেন যাঁদের একান্ত ভাগ্য থাকলে দেখা যায়। তাঁদের স্বভাব ও আচরণ একেবারে শিশুবৎ।

উমাপ্রসন্নবাবু সারাজীবন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে জীবন কাটিয়ে গেছেন। একবার কেদারনাথ দর্শনের জন্য কেদারে অবস্থানের সময় তিনি এইরূপ শক্তিধর এক সাধুকে দেখেছিলেন। আমার এই ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখের কারণ শুধু জানানো যে সাধনার বলে সন্ন্যাসীরা বা সাধুরা কতটা প্রকৃতিকে জয় করতে পারেন। শীত, গ্রীষ্ম, নিচের জমি বা বরফ ভরা পাহাড় তাঁদের কাছে সমতুল্য। কোন কিছুতেই তাঁদের বিকার নেই—

সেবারে উমাপ্রসন্নবাবু কিছু সঙ্গী সাথী নিয়ে কেদারনাথ মন্দিরের পিছনে যে বরফ ঢাকা সুউচ্চ পাহাড় দেখা যায় তার পাদদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁদের নজর পড়েছিল পাহাড়ের একেবারে শীর্ষস্থানে কি একটা বিন্দু মতন দেখা গিয়েছিল। ওঁরা তাকিয়ে দেখেছিলেন সেই কালো বিন্দুটা যেন নড়া চড়া করছিল।

ওঁরা অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়েছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর সেই কালো মতন বিন্দুটা বড় হতে শুরু করেছিল ও ধীরে ধীরে একটি মানুষের আকার ধারণ করেছিল। প্রকাণ্ড জটাধারী একজন নাগা সন্ন্যাসী। তিনি নেমে এসে সোজা তাঁদের সামনে এসেছিলেন। একেবারে দিগম্বর দেহে কোন আবরণের বালাই নেই; নগ্নপদ, কৃষ্ণাভ রং রোদে গোড়া। তবে সারা দেহ ঘিরে যেন একটা ঔজ্জ্বল্য বিরাজ করছে।

তিনি লিখেছেন যে তাঁদের মনে হয়েছিল যে কৈলাস থেকে কি মহাদেব নেমে এলেন? ঐ উচ্চ পাহাড়ের ওপার থেকে ঐ ভীষণ বরফের উপর দিয়ে কেউ হেঁটে আসতে পারে নগ্ন পদে, নগ্ন গাত্রে, এটা তাঁদের কল্পনার বা ধারণার বাইরে ছিল।

সাধু তাঁদের কাছে আসা মাত্র তাঁরা হেট হয়ে প্রণাম করেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর আগমন কোথা থেকে, তিনি ছিলেন মৌনী মুখে কোন জবাব দেন নি, শুধু হাত দিয়ে ঐ বিশাল বরফ ভরা পাহাড়ের অপর পিঠটা দেখিয়েছিলেন। ওঁরা বুঝেছিলেন তাঁর আগমন গঙ্গোত্রী বা যমুনোত্রী থেকে। কোথায় যাবেন জিজ্ঞাসা করলে সেই ভাবেই উত্তর পেয়েছিলেন। হাত নেড়ে কেদারশ্বরের মন্দির দেখিয়েছিলেন।

উমাপ্রসন্নবাবুর সঙ্গীদের কারও হাতে ছিল দূরবীন। চেয়ে নিয়েছিলেন এবং চাকা ঘুরিয়ে Focus করে চারিদিক দেখেছিলেন। এরপর তাঁর কোন সঙ্গী Photo তুলতে Camera বার করতেই হাত নেড়ে বারণ করেছিলেন ও পুনরায় তর তর করে সেই বরফ ভরা পাহাড়ে বরফের উপর দিয়ে উপরদিকে উঠে গিয়েছিলেন।

এঁরা সকলে আশ্চর্য হয়েছিলেন, উপরে খানিকটা উঠে শুয়ে পড়েছিলেন বরফের উপরে ও হাত নেড়ে ইশারা করেছিলেন ছবি তোলার জন্য। শুরু হয়েছিল তাঁর শিশু সুলভ খেলা। চারপাশে গড়াগড়ি দিয়েছিলেন যেন একেবারে শিশু।

তারপর নেমে এসেছিলেন। সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন পুনরায়। সকলের দিকে চেয়ে মৃদু হাস্য করেছিলেন। উমাপ্রসন্ন বাবুরা পুনরায় নত হয়ে প্রণাম জানিয়েছিলেন। মৃদু হাস্য করে হাত তুলে সকলের দিকে, ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছিলেন কেদারনাথ মন্দিরের দিকে।

হাত তুলে হয়ত সকলকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। উমাপ্রসন্নবাবু লিখেছেন, দেবতা অবতীর্ণ হলেন, সেটা লেখা রইল বা ধরা রইল মানুষের যন্ত্রে, এই Camera- র Film-এ। উমাপ্রসন্নবাবুরা নিষ্পলক নেত্রে সেই দিকে চেয়ে রইলেন। (পঞ্চকেদার ৩৬ ও ৩৭ পৃ. সারাংশ)।

সাধুর এই ক্ষমতাকে কি বলব? কি করে অর্জিত হয়েছিল এই অস্বাভাবিক সহ্য শক্তি? শিশুর মত ব্যবহার। সুনীলদা ও বিমলাদির মুখে শুনে ফক্কড়বাবার ক্ষমতা সম্বন্ধে যে সন্দেহ মাঝে মাঝে মনে উদিত হোত বা সেই সব কাহিনী বিশ্বাস করব কিনা সন্দেহের দোলায় দুলতাম, তা মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। তাঁদের প্রতিটি কথা আমার স্থির বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছিল। মহারাজজী যখন বালানন্দজীর মহাপ্রয়াণের পর আশ্রম থেকে অজ্ঞাত হয়ে গিয়েছিলেন তখন তিনি বহু তীর্থ পরিক্রমা করেছিলেন, সঙ্গ পেয়েছিলেন নাগা সন্ন্যাসীদের। তাঁর মতে, হিন্দু নাগা সন্ন্যাসীরাই হিন্দু সাধু নামের উপযুক্ত।

মনে পড়ে যাচ্ছে আমাদের গুরু মহারাজজীর একটি ঘটনা। ঘটনার স্থান বদরীনাথ পাহাড়। শ্রীশ্রীবালানন্দজী সবে মহাপ্রয়াণ করেছেন মহারাজজীকে সেবায়েৎ পদে ও Trust-এর Managing Trustee-র পদে আসীন করিয়ে দিয়ে তাঁর একান্ত অনিচ্ছা বা আপত্তি সত্ত্বেও। মহারাজজী বিশেষ ভাবে নারাজ ছিলেন এইভাবে বাঁধা পড়তে। কিন্তু শ্রীগুরুর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারেন নি। তাঁর ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে আশ্রমের ভার গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর গুরুদেবের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হবার পরেই শ্রীকেবলানন্দজীর হাতে আশ্রমের ভার দিয়ে আশ্রম ছেড়ে 'অজ্ঞাত' হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় বেশ কিছু সময় অজ্ঞাত ছিলেন ও কাহাকেও কোন সংবাদ দেন নি। কোথায় কোথায় বাস করেছিলেন তার সন্ধান পাওয়া যায় নি।

"যে দেশে ভগবানের নাম হয়, সে দেশ পবিত্র। যাঁরা ভগবানের নামরসে সর্বদা নিজেদের সিক্ত রাখেন, সে সব মহাপুরুষের গায়ের বাতাসে আমাদের দেহেও ভাগবতী শক্তির বিকাশ হয়। যে সাধু নিত্য নামকীর্তন করেন, তাঁর গ্রামের বাতাসও শুভ্র জলকণার ন্যায় সকলকে স্নিগ্ধ, শান্ত ও পবিত্র করে।"

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

বৈদ্যনাথ ধামের সচল বৈদ্যনাথ

শ্রী রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

ওম্ একটি মহাজাগতিক পবিত্র শব্দ। এই প্রণব মন্ত্রটি তিনটি শব্দাংশ নিয়ে গঠিত। অ-উ-ম যাকে বলা হয় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। যিনি এই শিকল জয় করেছেন তাঁকে আমরা বলে থাকি মহাকাল। তিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন আবার বিশ্ব বিনাশ হয়ে গেলেও তিনিই থাকবেন। তিনি আর কেউ নন দেবাদিদেব অর্থাৎ সর্ব দেবতার আগে যাঁর জন্ম মহাদেব। ইনি হলেন আদি যোগী পুরুষ যাকে আমরা শিব রূপে পূজা করে থাকি। তিনি আমাদের নিকট পরম পূজনীয়। যাঁকে তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। পরম গুরু মহারাজ সিদ্ধ পুরুষ শ্রী শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী যিনি শিবের অংশোদ্ভুত ধারায় মনুষ্য রূপে দেহ ধারন করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (আনুমানিক ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে) তাঁর পরম পূজনীয় পিতৃদেবের নাম বংশীলাল এবং মাতার নাম ছিল নর্মদা বাঈ। পিতৃদেব বংশীলাল উজ্জয়িনীতে মহাকালেশ্বরের মন্দিরের একজন নিষ্ঠাবান পুরোহিত ছিলেন। মাতা নর্মদাবাঈ তেমন সুশিক্ষিত তা ছিলেন না কিন্তু তাঁর হিন্দু ধর্মের প্রতি গভীর জ্ঞান ছিল। কম শিক্ষিত হয়ে ঐশ্বরিক জ্ঞানের এতটাই আধিক্য ছিল যে সেকালের প্রখ্যাত পুরোহিতরা তাঁর কাছে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য আসতেন। বংশীলাল ছিলেন হিমালয় অঞ্চলের মহাপীঠস্থান জ্বালামুখীর অধিবাসী। উজ্জয়নীর অনাদি শিবলিঙ্গ মহাকালের পূজারী পুরুষোত্তম ও লক্ষ্মী দেবীর একমাত্র সন্তান নর্মদার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর বংশীলাল জ্বালামুখী ছেড়ে সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়িতেই বসবাস করেন এবং মহাকাল মন্দিরে কাজে ব্রতী হন। মহাকাল হলো দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম। সন্তান লাভের আশায় ভক্তিমতী নর্মদাবাঈ গোপালের আরাধনা করেন। এই আরাধনা করার সময় এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন এই নর্মদাবাঈ। স্বপ্নটি হল গোপাল তাকে বলছেন যে তিনি তাঁর কাছে সন্তান রূপে আসছেন। ওই স্বপ্ন দর্শনের পর ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দ দ্বাদশী তিথিতে নর্মদাবাঈ-এর গর্ভে কোল আলো করে জন্মগ্রহণ করেন আমাদের পরমপূজ্য পীতাম্বর যাঁর পরবর্তীকালে নাম হয়েছিল বালানন্দ। স্বয়ং বালগোপাল সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন এই ভাবনা থেকেই পিতা বংশীলাল ও নর্মদা পুত্রের নাম রেখেছিলেন পীতাম্বর। ছেলে পীতাম্বর শিপ্রা নদীর তীরে মন্দির আর সাধুদের সঙ্গলাভ করে আনন্দে দিন কাটাতেন। মাতা নর্মদাবাঈ ছিলেন অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণ মহিলা এবং পুত্রকে তিনি খুব আদর করতেন। তিনি এই পুত্র সন্তানকে নিয়ে যেমন আনন্দে দিন কাটাতেন আবার তেমনি খুব চিন্তাও করতেন। কারণ এই সন্তান কখনো কখনো শ্মশানে গিয়ে ধ্যান করতেন আবার কখনো কখনো তিনি আত্মার সন্ধানে ভুতুড়ে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িগুলি অন্বেষণ করতে যেতেন। এক এক সময় তিনি বেশ কয়েকদিন গভীর জঙ্গলের মধ্যে হারিয়েও যেতেন। পীতাম্বরের এই

বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার স্বভাব মাকে খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। মায়ের সর্বদা পুত্র হারানোর ভয় হত। সেই ভয়ে মা তাকে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে কাছে টেনে রাখতেন। কিন্তু মহাদেবকে কে কবে কোথায় বন্ধনে বাঁধতে সমর্থ হয়েছিল? কারণ মহাদেব সীমাহীন, তাকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে রাখা সামান্য ব্যাপার নয় এবং তা ছিল মনুষ্য ক্ষমতার বাইরে। তিনি এক সময় মানবিক সম্পর্ক ত্যাগ করে এই অনিত্য নশ্বর আশা আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করে পরম দেবত্ব লাভ করার জন্য গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছিল নয় বছর। ওই বয়সে তাঁর উপনয়ন হয়েছিল এবং উপনয়নের তিনদিন যেতে না যেতেই তিনি গর্ভধারিণী মায়ের স্নেহডোর ছিন্ন করে নদী রূপিনী জগৎ জননী নর্মদার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তাঁর ঐশ্বরিক পথের যাত্রা শুরু। এই সময় নানান রহস্যময় ঘটনার সম্মুখীন হন তিনি। এই সময়ের মধ্যে যখন তিনি গুজরাটের গঙ্গোনাথে পৌঁছেছিলেন, সে সময় তিনি শ্রী শ্রী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে প্রথম গুরুরূপে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই গুরু তাঁকে নাস্তিক ব্রহ্মচারী হিসাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন। পরে এই গুরুর পরামর্শে তিনি নর্মদা নদী পরিক্রমণ করেন। সে সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন শ্রীশ্রী গৌরীশঙ্কর মহারাজজী। ব্রহ্মানন্দ মহারাজজী, তাঁর সন্ন্যাস নামকরণ করেন বালানন্দ ব্রহ্মচারী। তিনি নামকরা সাধক শ্রী শ্রী গৌরীশঙ্কর মহারাজের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেন। বালানন্দ ব্রহ্মচারী নামকরণের পর তিনি বিভিন্ন তীর্থস্থান পায়ে হেঁটে পরিক্রমা করেন। তিনি হিমালয়ের চরম উচ্চতায় যোগ ক্রিয়ার সাথে তীব্র সাধনার মাধ্যমে কাটান। হিমাচল প্রদেশে থাকার সময় শ্রী শ্রী মানসাগিরি মহারাজের সংস্পর্শে আসেন। ওই গিরি মহারাজ একটি ঐশ্বরিক নির্দেশ পেয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমে বালানন্দজীকে সমতল ভূমিতে ফিরে আসতে বলেন এবং সে সময় বালানন্দজী মহাশয় পবিত্র গঙ্গার উৎপত্তিস্থল গোমুখ পরিদর্শন করেন। একবার ব্রহ্মচারীজী কামাখ্যা গিয়ে কলেরাতে আক্রান্ত হন। মরণাপন্ন সময়ে তিনি দেবীর দর্শন লাভ করেন। দেবীর কৃপায় সুস্থ হন। নর্মদা পরিক্রমণ কালে তিনি সেখানে বিখ্যাত যোগী মার্কণ্ডের নিকট যোগ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এরপর কাশির দশাশ্বমেধ ঘাটে ধ্রুবেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী স্বামী রামগিরি মহারাজকে গুরুরূপে পেয়ে সেখানে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেন ও বেদান্তে জ্ঞান লাভ করেন। যোগী শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি পশ্চিমবাংলার নবদ্বীপ ও রানাঘাটে এসেছিলেন। রানাঘাটের তৎকালীন মহকুমা শাসক রাম বসুকে একটা বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। পরম পূজ্য বালানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন শিবের উপাসক। ইনি একজন তপসিদ্ধ যোগী ছিলেন।অনেকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণও পেয়েছিলেন। বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের পর অবশেষে ঐশ্বরিক নিয়তি তাঁকে শ্রী শ্রী বৈদ্যনাথ ধাম দেওঘরের পবিত্র ভূমিতে নিয়ে আসেন। এখানে তিনি তপোবন পাহাড়ে শ্রী শ্রী তপোনাথ মহাদেব এর পাদপদ্মে সাধনায় বহু বছর অতিবাহিত করেন। ওই সময় তাঁর হাজার হাজার ভক্ত হয় এবং তিনি ওই সমস্ত ভক্তদের জ্ঞান দান করতেন। ভক্তদের অনুরোধে তিনি তপোবন পাহাড় থেকে নীচে নেমে এসে করণিবাদে শ্রী শ্রী বালানন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলি এই আশ্রমে অতিবাহিত হয়। এই আশ্রমে বসবাস করার সময় তিনি মানুষের সেবা দানের জন্য একটি আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তাই নয় এই সময়ে অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী একজন। এই মোহনানন্দকে তিনি মোহন বলে ডাকতেন। সকল শিষ্যদের

মধ্যে তার প্রিয় শিষ্য ছিল এই মোহনানন্দ মহারাজজী। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর প্রিয়তম শিষ্য মোহনানন্দজীর উপর এই আশ্রমের ভার অর্পণ করেছিলেন। শ্রীশ্রী বালেশ্বরী মাকে আমাদের পরম গুরু মহারাজ প্রতিষ্ঠা করে অভিষিক্ত করেন। তিনি আশ্রমে শ্রী শ্রী বালা ত্রিপুরা সুন্দরী মা— শ্রীশ্রী বালেশ্বরী মা যাঁর নাম এবং শ্রী শ্রী বাল ঈশ্বরনাথ মহাদেবের মন্দির স্থাপন করেছিলেন।

পরম গুরু মহারাজ ব্রহ্মচারী বালানন্দ স্বামী বলতেন; ম্যানেজার বানো, মালিক না;-এর মাধ্যমে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করে যে ঈশ্বরের ঐশ্বরিক সৃষ্টিতে যিনি আমাদের সকলের মালিক এবং এই পৃথিবীতে থাকার সময় আমরা পরিচারক ছাড়া আর কিছু নই। এই সুন্দর পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর তা সবই দেবতার সৃষ্টি এবং এই সৃষ্টিকে আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা কর্তব্য। আমরা যা কিছু ভালো মন্দ নির্মাণ করি না কেন তা আমাদের নয়। স্বামী বালানন্দ ব্রহ্মচারী আমাদের আধ্যাত্মিক গুরু ও পথপ্রদর্শক। তিনিই আমাদের রক্ষাকর্তা, আমাদের মহাকাল এবং আমাদের সত্য সুন্দর শিব।

কথিত আছে রামচরণ বসু নামে এক বাঙালি সাহেব যিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি আস্থা রাখতেন না। এমনকি সাধু সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন না বরং অবজ্ঞা করতেন বেশি। একদিন গভীর রাতে শ্মশান সংলগ্ন নদী তীরে প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি এক অলৌকিক দৃশ্য দেখলেন। তার ফলে সাধুদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তাঁর অনুশোচনা হল কেন তিনি যথাযোগ্য একজন সাধুকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে পারেননি। ওই সাধু আর কেউ নন ছিলেন বালানন্দ ব্রহ্মচারী। তিনি রামচরণ বসুকে এক ট্রেন দুর্ঘটনার দায়ী অভিযুক্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই রামচরণ বসুই হলো মহর্ষি বালানন্দ মহাপ্রভুর প্রথম শিষ্য।

এই বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে তখনকার সময়ে মানুষেরা বলতো দেওঘরের সচল বৈদ্যনাথ। তাঁর অনেক অলৌকিক কাহিনী আছে যা এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হ'লনা বলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি প্রার্থনা করি। পরে কোন এক সময়ে সুযোগ পেলে সেগুলো সংগ্রহ করে আপনাদের সমক্ষে আনব , আশা রইল।

আমাদের গুরুদেব গুরুমহারাজ শ্রীশ্রী মোহনানন্দজী-র গুরুদেব শ্রী শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীর কিছু অমৃতময় বাণী এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো গুরু মহারাজের শিষ্যদের আধ্যাত্মিক চেতনা, সাংসারিক জীবন পথে চলার ও সাহায্য লাভের জন্য। গুরুজীর এই বাণীগুলো মনে রেখে আমাদিগকে আগামী দিনের পথে অগ্রসর হতে হবে ।এই অবক্ষয় সমাজে মানুষের মধ্যে মানবিক উন্নতি সাধনের জন্য ছড়িয়ে দিতে হবে। তবেই গুরুজীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো আমাদের সার্থক হবে।

পরম পুরুষ মহর্ষি বালানন্দ ব্রহ্মচারীর অমৃতময় বাণীগুলোর মধ্যে দুটি বাণী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল —

১) অপরের দোষ না দেখে গুণ দেখা এবং নিজের গুণ না দেখে দোষ দেখা ও সেই দোষ দূর করতে যত্নবান হওয়া উন্নত জীবন লাভের সুন্দর , সহজ ও সরল উপায়।

২) গুরু প্রদত্ত বীজ মন্ত্রকে রোজ বারি দিয়ে সিঞ্চন করতে হবে। বীজকে পচিয়ে ফেললে চলবে না। তারপর যখন অঙ্কুর জন্ম নেবে সেটিকে তখন নামমাত্র বেড়া দিতে হয়। তাহলে আর ইন্দ্রিয়রূপী জানোয়াররা তাকে খেতে পারবে না। যখন ধীরে ধীরে অঙ্কুর পুষ্ট হবে, হঠাৎ শিষ্য যখন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত

হবে, তখন ইন্দ্রিয়াদি পশুগুলি সেই গাছের গুঁড়িতে বাঁধা থাকতে পারবে। —শিষ্য তখন একদম নিশ্চিত হয়ে নির্ভয়ে, সেই ধর্ম বৃক্ষের ছায়ায় জীবন কাটাতে পারবে।

আগ্রহী সাধক ও ধর্ম মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ মনে করলে তাঁর বাণীগুলো সংগ্রহে রাখতে পারেন। এই প্রবন্ধের এখানে ইতি টানছি। এসব প্রবন্ধ স্বল্প পরিসরে লিখতে গিয়ে মন ভরেনা। যা আরো জানার আছে তা সকলকে জানাতেই মন চায়। সাধনার পথে যে আগুন মনের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত থাকে তাকে নিভাতে মন কি চায়?

মহর্ষি বালানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন দেওঘরের চলন্ত মহাদেব বা বৈদ্যনাথ। তাঁর অমর অক্ষয় বাণীগুলি পাঠ করে মনে হয় আমাদের ইহলৌকিক জগৎ কত মিথ্যা আর আমরা মিথ্যে মায়ার বাঁধনে সেই নিত্য পরমপুরুষকে অবজ্ঞা করে দিনে রাত্রে কত কি করে চলেছি তা ভাবলে আত্মগ্লানিতে মন ভরে যায়। হে দয়াময়, হে প্রভু, তুমি না করিলে কৃপা কে করিবে পার , এই ভব সংসার। কৃপা কর প্রভু এই অভাজনে।

ওঁম শান্তি! ওঁম শান্তি! ওঁম শান্তি! ওঁম শান্তি!

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর একান্ত প্রিয় ও আশীর্বাদধন্য

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনেরও এক পরম আশীর্বাদ।
তাই 'বালেশ্বরী'-কে ভালোবেসে সে পত্রিকায় আপনাদের
লেখা ও মতামত পাঠিয়ে পত্রিকার সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হন।

অনেক আগ্রহী পাঠক আমাদের জানিয়েছেন যে, গ্রাহক হবার সময় ও পদ্ধতি সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্যাদির অভাবে ইচ্ছাসত্ত্বেও তাঁরা গ্রাহক হতে পারেন নি। সকলের অবগতির জন্য তাই জানানো হচ্ছে যে, বছরের যে-কোনো সময়েই পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক হলে সেই বছরের বিগত সংখ্যাগুলিও একত্রেই পাবেন। এ-জন্য আমাদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় অথবা নিকটবর্তী ডিস্ট্রিবিউটিং সেন্টারগুলিতেও (নাম-ঠিকানা সহ তালিকা এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছে) বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে।

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি

এ.ই. ৪৬৭, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, ফোন: ৩২১ ৫০৭৭

Distributing Centres of Sree Sree Baleswari Patrika

1. **ASANSOL**
   Sri Trilok Dutta,
   "Mohan Asis", Street No. S/5 Sarodapally,
   Ashok Nagar, Asansol
   Dist. : Burdwan (WB)
   Pin : 713 304 Mob.: 9434838138

2. **BAHARAMPUR**
   Mohanananda Debyatan,
   Satyendra Nath Sarkar/Samrat Sen
   5, Churamoni Chowdhury Lane,
   Pin:742101
   Baharampur, Murshidabad.
   Ph. : 03482-251439
   Mob. : 9433330215

3. **BALLY**
   Smt. Chitra Chakraborty
   16, Dharmatala Road (North)
   Badamtala moe, Bally, Howrah:711201
   Mob. : 9477460626

4. **DEOGHAR**
   Sree Sree Balananda Ashram,
   P.O. Ashram Karanibad,
   Baidyanath Dham, Deoghar
   Jharkhand - 814143
   Ph.: 09955673586
   Mobile : 6203886498

5. **DURGAPUR**
   Sree Sree Balananda Tirthashram,
   Srimat Chidananda Brahmachari
   Nadiha, Durgapur, Dist. Burdwan,
   Pin: 713201
   Ph. : 0343-2557167
   Mob. : 09934189144 / 9434331258

6. **HOWRAH**
   Tarun & Mili Mukherjee
   220, G. T. Road, Howrah-711102
   Ph.: 2642-6831/7659
   Mob.: 9830411719

7. **Asis Dey**
   Domjur, Howrah
   Near Domjur Post Office
   Mob: 9804568070

8. **KOLKATA**
   Shree Shree Mohanananda
   Samaj Seva Samity.
   AE-467, Salt Lake City,
   Kolkata - 700 064
   Ph. : 2321-5077/5123
   Mob: 8017227099

9. Sri Sri Balananda Ashram
   10/3, Jamir Lane,
   Kolkata - 700 019
   Ph. : 2440-0933

10. **Sri Kalyan Lahiri**
    28/1, Fakir Ch. Mitra Street
    Kolkata - 700 009
    Ph. : 9903050408

11. **Smt. Kanika Paul**
    120, Garfa Main Road
    Kolkata - 700 075
    Ph. : 2418-2207
    Mobile : 9433389404

Distributing Centres of Sree Sree Baleswari Patrika

12. **Sri Ashis Bhadra**
58/1/1 K, Raja Dinendra Street
Kolkata - 700 006
Ph. : 2351-8684
Mobile : 9836748040/6290417114

13. **Baranagar Kirtan Sangha**
C/o, Ranu Roy
74/1, Raimohan Banerjee Road
Bonhooghly, Kolkata
Mobile : 8697519097

14. **Smt. Barnali Banerjee**
Jugal Mandir Sree Sree Balananda
Ashram
Dunlop
Mobile. : 9051547954

15. **Sri Amit Bose**
17/10A, Jai Ramporejala Road
'Silver Hights' 4th Floor 4D,
Kolkata- 700 060
(Opposite LIC Staff Building)
Mob. : 8240119722/983023432

16. **MALDA**
Sri Anindya Kumar Roy
Sujata Building, 1st Floor;
Near Matri Sadan,
Vivekananda Pally,
Malda - 732101. W.B.
Mob. : 9474656721/7866807052

17. **MIDNAPUR**
Sri Sukumar Mitra
Mitra Compound
Station Road,
Paschim Midnapur-721161
Ph. : 033222261114
Mobile : 9474713822 /6295913476

18. **Ratan Ghatak**
49, Subhas Avenue
P.O. Ranaghat
Mob: 9932787128

19. **Shib Niwas**
Sri Tarun Banerjee
Shibniwas, Nadia
Mob: 9734809767

20. **SILIGURI**
Dr. Ramendu Das
80, Collegepara,
P.O. Siliguri - 734401
Mobile : 9434035048

MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY
Rangamati path, Bidhannagar, Durgapur-713212, West Bengal
(A DEDICATED CANCER HOSPITAL)

LIST OF DONORS (FOR THE PERIOD 01/06/2024 to 21/10/2024)

DATE	RT. NO.	NAME	AMOUNT (Rs.)
01-06-2024 to 01-10-2024		P & J CHANDRA FINANCIAL SERVICE PVT.LTD-KOLKATA	10000.00
07-06-2024	1596	S. BISWAS-KOLKATA	2000.00
12-06-2024	1597	A WELL WISHER - KOLKATA	1001.00
27-06-2024	1611	A WELL WISHER - ASANSOL	1000.00
01-07-2024	1612	A WELL WISHER	1180.00
05-07-2024	1613	A WELL WISHER	1000.00
08-07-2024	1598	A WELL WISHER - KOLKATA	1001.00
14-07-2024		DISHA BHATTACHARYA	101.00
15-07-2024	1599	ASIT KUMAR SEN - KOLKATA	10000.00
16-07-2024	1614	SUSHIM MUNSHI - U.S.A.	10000.00
23-07-2024	1615	ARIJIT GHOSH - KOLKATA	5000.00
23-07-2024	1616	MINATI HAZRA ANDAL	1500.00
23-07-2024	1617	A WELL WISHER	900.00
02-08-2024	1619	ARIJIT GHOSE - KOLKATA	750.00
05-08-2024		RASHMI PATRA	5172.81
12-08-2024		HETERO HEALTHCARELTD-KOLKATA/HYDERABAD	13500.00
16-08-2024	1620	BARUN CHANDA - KOLKATA	60000.00
17-08-2024	1618	A WELL WISHER	720.00
22-08-2024	1621	DEBASIS PAUL, ALOKA PAUL, DEBARUN PAUL & DEBADRITA PAUL ASANSOL	5000.00
02-09-2024		SOMA MITRA	2000.00
02-09-2024		ARIJIT GHOSE - KOLKATA	750.00
04-09-2024	1622	PRITHIRAJ SAMANTA & PIYASI SAMANTA - KALNA	1000.00
10-09-2024	1623	A WELL WISHER	800.00
11-09-2024	1624	ARIJIT GHOSE - KOLKATA	750.00

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজীর শ্রীচরণাশ্রিত শ্রী শঙ্কর ভৌমিক ও শ্রীমতী রুণা ভৌমিকের সৌজন্যে

21-09-2024	1701	ASHIS SENGUPTA - KOLKATA	500.00
21-09-2024	1702	ANUP KUMAR SARKAR - KOLKATA	500.00
30-09-2024		ARIJIT GHOSE KOLKATA	750.00
01-10-2024	941	A WELL WISHER	1160.00
04-10-2024	1705	Smt. SARBANI SINHA - KOLKATA	10000.00
07-10-2024	1350	PRANATI SARKAR - DURGAPUR	2000.00
21-10-2024		NANDINI ROY (FOR ENDOSCOPY EQUIPMENT)	1600000.00

PLEASE SEND YOUR DONATION:-
For Donation in Indian Rupees:
f the Bank Account: **MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC AND WELFARE SOCIETY**. Name of the Bank : **STATE BANK OF INDIA, MUCHIPARA BRANCH, DURGAPUR-713212, BURDWAN, ACCOUNT NO. 35626526750, BRANCH CODE: 6888, IFS CODE: SBIN0006888. WEST BENGAL.**

For Donation in Foreign Currency:
Name of the Bank Account: **MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC AND WELFARE SOCIETY.** Name of the Bank **STATE BANK OF INDIA, 11, SANSAD MARG, NEW DELHI-110001, BRANCH CODE: 00691 ACCOUNT NO. 40283076692 SWIFT CODE: SBININBB104, IFS CODE: SBIN0000691**, Account Type: FCRA **(Savings).**

For Baleswari Patrika
Shree Shree Mohanananda Samaj Seva Samity
SBI, SALTLAKE,
AE-MARKET BRANCH,
KOLKATA-64
A/c No. 10527195247– IFC CODE-SBIN0006794

উদার অভ্যুদয়...

"মহারাজ একি সাজে
এলে হৃদয় পুরমাঝে চরণতলে কোটি শশী
সূর্যমরে লাজে...."

আমাদের মনে হয় কবিগুরু যেন আমাদের গুরুদেবের উদ্দেশ্যেই এই গানটি লিখেছেন। শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন, যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হবে, তখনই তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হবেন। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যপূর্বযুগে কাব্যে কবিতায় মানুষের সুখ-দুঃখের কোনও স্থান ছিল না। সাধনা ছিল শুষ্ক। যাগ-যজ্ঞ-তন্ত্র এইসব কিছুর প্রচলন ছিল সেই সময়কার সমাজ ব্যবস্থায়।

চৈতন্যমহাপ্রভুই প্রথম আনলেন জীবন্ত মানুষের জীবন কথা নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি। যেরকম রূপ, তেমন ব্যবহার, গভীর তাঁর আবেদন, জ্ঞানের ভাণ্ডার আর উপলব্ধি ও অনুভূতি যা তাঁর আগের যুগে কারও মধ্যেই পাওয়া যায়নি। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং যুক্তির কাছে হার মানতে হয়েছে সেই সময়কার সকল পণ্ডিতকে। চৈতন্যকে ভালো বেসে মানুষ ভালো বাসতে শিখল। তাদের মনের বরফ গললো। তাদের চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুধারা, এমন ভাবাবেগ। হরিনাম বিলিয়ে গেলেন আচণ্ডালে। চৈতন্যোত্তর যুগে চণ্ডীদাসের লেখা—

'মানুষ মানুষ সবাই কহয়, মানুষ কেমন জন?'

...এই প্রশ্ন মানুষকেই করতে শেখালেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। মানুষের ঈশ্বরে অনুরাগ আসল, প্রাণে আসল ব্যাকুলতা।

আর চৈতন্যযুগের পরে বহু ঋষি-মনীষির আবির্ভাব হয় এই সনাতন ভারতবর্ষে।১৯০৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী দশমীবিদ্ধা একাদশীতে আবার স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হন এই ধরাভূমিতে। আমাদের গুরু মহারাজ যেন মানব কল্যাণের প্রতিমূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন অদৃশ্য কোনও এক ঐশী ইচ্ছায়। তারপর চলতে লাগল "আপন বেগে পাগল পারার গতি", মহাপ্রভু যে রকম নাম সংকীর্তনের মধ্যে সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধান করে দিতেন, আমাদের গুরুদেবও তেমনি তাঁর গানের মাধ্যমে সুন্দর সুন্দর কথাকলির মালা গেঁথে আমাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়ে গেছেন, মোরা "নীরব হয়ে শুনি, তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী"...

আসুন আমরা প্রদীপ জ্বালিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে সবাইমিলে আমাদের শ্রীশ্রীগুরুদেবের ১২১তম জন্মতিথি পালন করি একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্যমুলক আচরণের মাধ্যমে।

জয়গুরু, জয়গুরু, জয়গুরু

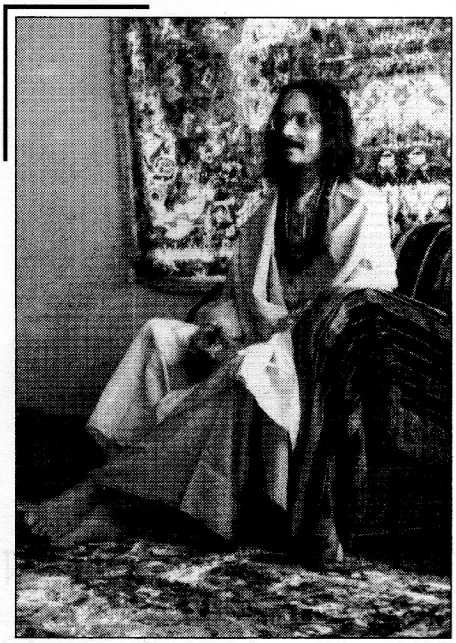

শুভ জন্মতিথি - ১৪০১

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকার পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, গ্রাহকবৃন্দ ও দেশ-বিদেশের সমগ্র ভক্ত-শিষ্যমণ্ডলীর উপর শুভ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজীর শুভাশীর্বাদ বর্ষিত হোক।।